মূর্ছনা

শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়

মূর্ছনা

সঙ্গীত শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

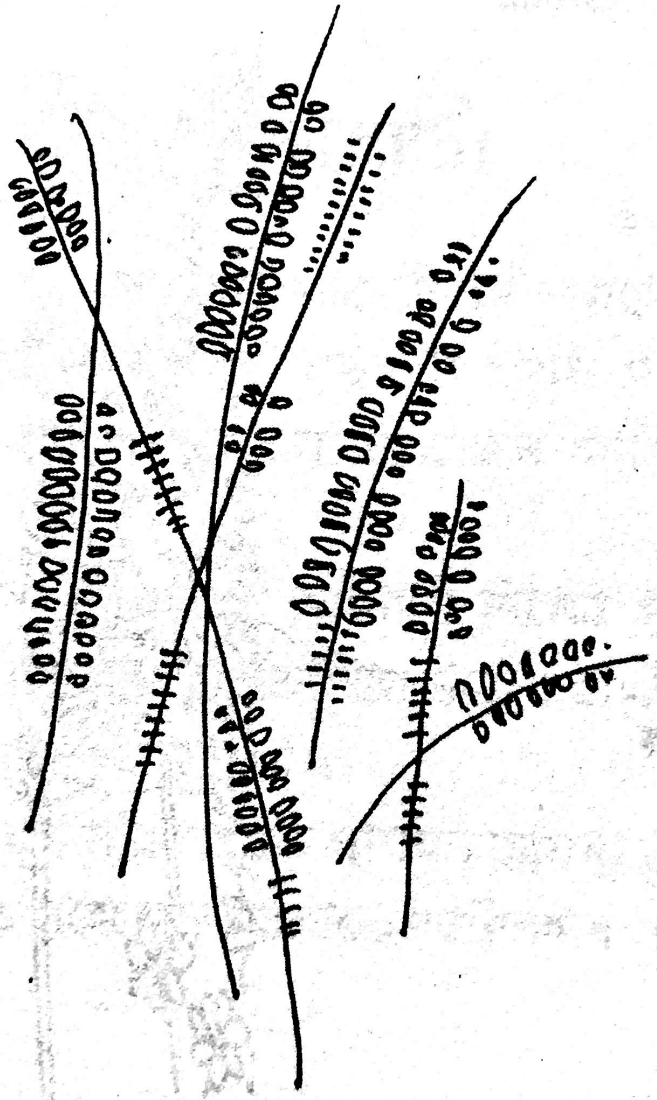

শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়

লিচুবাগান, আগরতলা

মূর্ছনা

সঙ্গীত শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

Murchana

A House Magazine on Music, Art & Culture
Published on behalf of
Sachin Debbarman Memorial Govt.-
Music College, Agartala

প্রথম প্রকাশ
১৪ আগস্ট, ২০০৯

সহিত্যপত্র উপসমিতি
মনিকা দাস ঃ আহ্বায়ক
মৃণাল রায় ঃ সদস্য
কল্পনা দে ঃ সদস্য
শুক্লা ভট্টাচার্য ঃ সদস্য

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
স্বপন নন্দী
অক্ষর বিন্যাস
নারায়ণ দেবনাথ

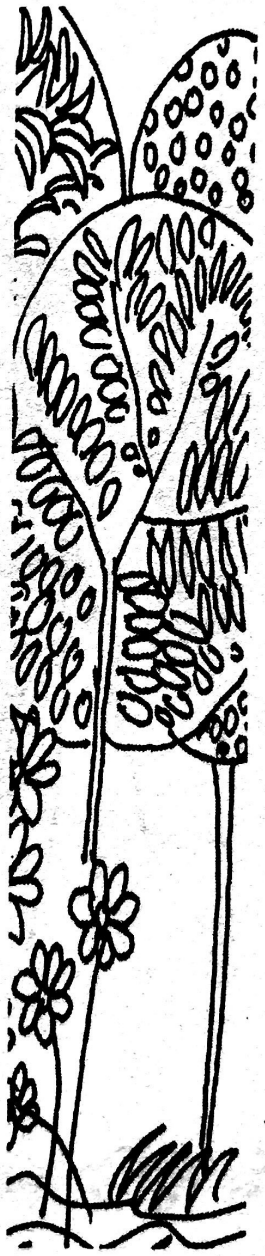

ছন্দোময় এখানকার
আকাশ বাতাস
সুরের আবহে কাটে
বারোটি মাস।
অঙ্গে বিভঙ্গ তুলে
নৃত্যশিল্পীগণ
বাণীবন্দনার পর হয়
সারস্বত সম্মেলন
বসন্ত বন্দনাতে
সকলে এখানে
নৃত্যময় দোল খেলে
পলাশ রাঙা মনে
বৈশাখের প্রথমেতে
হয় বর্ষবরণ
নৃত্য-গীত বাদ্যে করি
রবি- নজরুল স্মরণ
মেঘমেদুর আকাশে যখন
ঝরে বৃষ্টির ঝরণা
মল্লার রাগে করি
বর্ষা বন্দনা
ভাষা বন্দনা হয়
একুশে ফেব্রুয়ারী
মাতৃভাষায় শহীদগণকে
সেদিন স্মরণ করি।

শচীন দেববর্মন সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক সংসদের পক্ষে মৃণাল রায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং
কর্ণেল চৌমুহনিস্থিত নন্দনচর্চা (ফোন ঃ ০৯৮৬২১৩৭১৫২) থেকে মুদ্রিত

সত্যমেব জয়তে

মন্ত্রী
উচ্চ শিক্ষা, তথ্য, সংস্কৃতি
ও পর্যটন এবং তপশিলী জাতি
কল্যাণ দপ্তর ত্রিপুরা সরকার

শুভেচ্ছাবার্তা

শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় তাদের সাংস্কৃতিক মুখপত্র 'মূর্ছনা'র প্রথম সংকলনটি অতি সম্প্রতি প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমি আশা করবো আগামী দিনের সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কুশীলবদের কর্মকাণ্ডের উজ্জ্বল স্বাক্ষরে ভাস্বর হয়ে উঠবে 'মূর্ছনা'র পৃষ্ঠাগুলি।

আমি 'মূর্ছনা'র সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং এর প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

অনিল সরকার

সূচীপত্র

১। শ্রদ্ধায় স্মরণ ঃ *সঙ্গীতাচার্য পুলিন ঠাকুর* ৫

২। শ্রদ্ধায় স্মরণ ঃ *বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে* ৮

৩। শ্রদ্ধায় স্মরণ ঃ *ত্রিপুরায় তবলা বাদনের পথিকৃত অশ্বিনীকুমার* ১১

৪। ওস্তাদ আলি আকবর খানের প্রয়াণে ঃ *শোকলিপি* ১৬

৫। একটি কাল্পনিক কথোপকথন ঃ *শ্রী রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য* ১৯

৬। রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম ঃ *শ্রীমতী শুক্লা ভট্টাচার্য্য* ২১

৭। নতুন ঠিকানা ঃ *শ্রী মৃণাল রায়* ২৩

৮। সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অতীত ও বর্তমান ঃ *শ্রী মৃণাল রায়* ২৪

৯। নামটি তাহার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ঃ *শ্রীমতী অঞ্জনা চক্রবর্তী* ২৬

১০। শান্তিনিকেতনের দিনগুলো ঃ *শ্রীমতী সুনেত্রা রায়* ২৭

১১। ভাটিয়ালি, বাংলার প্রাণের গান ঃ *শ্রীমতী মনিকা দাস* ৩২

১২। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উৎস ও প্রবাহ ঃ *শ্রীমতী কল্পনা দে* ৪১

১৩। বারি ঝরে ঝরো ঝরো ঃ *শ্রীমতী মিলি সাহা* ৪৬

১৪। সেই দিনগুলি ঃ *শ্রী শ্যামল দেব* ৪৮

১৫। History of Musical Instruments - Smt. Sarita Banik ৫৩

১৬। বর্তমান ভারতে রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধন উৎসবের তাৎপর্য ঃ *শ্রীমতী ছন্দা নন্দী* ৫৬

১৭। কুচিপুড়ি নৃত্য সম্পর্কে কিছু কথা ঃ *শ্রীমতী ববি চক্রবর্তী* ৫৯

১৮। কলাতীর্থ ঃ *শ্রীমতী কল্পনা দে* ৬১

১৯। কীর্তিমান পুলিন ঠাকুর ঃ *শ্রীমতী মনিকা দাস* ৬২

২০। সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ঃ *প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষিকা* ৬৩

২১। শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ঃ *বর্তমান শিক্ষক ও শিক্ষিকা* ৬৪

শ্রদ্ধায় স্মরণ

সঙ্গীতাচার্য পুলিন ঠাকুর

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিল্পী ও সাধক পুলিন দেববর্মা ১৯১৪ সালের ১০ই মার্চ আগরতলার কৃষ্ণনগরের ঠাকুর পল্লী রোডের টি.আর.টি.সি. সংলগ্ন বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুরের পূজারী, সঙ্গীতের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ এবং কণ্ঠে ছিল ঈশ্বর প্রদত্ত সুর।

ছোটবেলা থেকেই গতানুগতিক পড়াশুনায় তাঁর মন বসত না। স্কুল পালিয়ে গান গেয়ে বেড়াতে বা আখড়ায় গিয়ে কুস্তি করতে পছন্দ করতেন। ছেলের পড়াশুনোর প্রতি অমনযোগ লক্ষ্য করে তাঁর পিতা তাঁকে উমাকান্ত স্কুলের বোর্ডিং-এ ভর্তি করে দেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মুক্ত বিহঙ্গ, খোলা আকাশের নীচে স্বাধীনভাবে গান গেয়ে বেড়ানোই ছিল তাঁর একমাত্র নেশা ও আনন্দ। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ত্রিপুরার সঙ্গীতপ্রিয় মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর বালক পুলিনের গানের প্রশংসা শুনে তাঁকে তাঁর রাজসভায় ডেকে পাঠান এবং গান গাইতে বলেন এবং তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত শুনে অভিভূত হন। তারপরই তিনি পুলিন ঠাকুরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার জন্য ২৫ টাকা মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দেন। সেই সঙ্গীত বৃত্তির টাকায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেওয়ার জন্য তিনি লক্ষ্ণৌ-এর মরিস কলেজে গিয়ে ভর্তি হন। মরিস কলেজে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন ওস্তাদ রতন ঝংকার এবং আগা খাঁ। ওস্তাদ আগা খাঁ রঙ্গিলা ঘরানার প্রবর্তক ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাকা ছিলেন। সেই সময়ে লক্ষ্ণৌতে পুলিন ঠাকুরের সতীর্থরা ছিলেন — চিন্ময় লাহিড়ী, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পি.এন. চিনচোরে প্রমুখ। লক্ষ্ণৌতে বিশারদ ডিগ্রী লাভ করার পর ওস্তাদ বরকত আলি খাঁর নিকট আরও তিন বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেন। ওস্তাদ বরকত আলি খাঁ ছিলেন বিখ্যাত ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁর ভাই।

সঙ্গীত তাঁর কাছে সাধনার বস্তু ছিল। লক্ষ্ণৌর বীনা হোষ্টেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি রোজ ১৫/১৬ ঘন্টা রেওয়াজ করতেন। এই কঠোর সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন অর্থাৎ রঙ্গিলা ঘরানার গায়ন শৈলী ও তানকর্তব তিনি খুবই ভালভাবে রপ্ত করেছিলেন। রঙ্গিলা

ঘরানার বিশিষ্ট গায়ন শৈলী দানাদার তান যা কিনা খুবই তালিমী রেওয়াজ ছাড়া আয়ত্ব করা যায় না তা তাঁর কণ্ঠে অনায়াসলভ্য ছিল।

লক্ষ্ণৌ থেকে সঙ্গীতের শিক্ষা পর্ব সাঙ্গ করে তিনি কলকাতায় আসেন ত্রিশের দশকের শেষ দিকে। কলকাতায় তিনি ত্রিপুরার মহারাজার মর্ডান ব্যাংকে যোগ দেন। সেই সময়ে তিনি কলকাতা ও ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রোগ্রাম করতেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তাঁর নাম ও যশ কলকাতার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ছাত্রছাত্রীর ভিড়ও ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু মাটির টানে, জন্মভূমির টানে কলকাতা থেকে তিনি আগরতলায় চলে আসেন। একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে জন্মভূমির প্রতি দায়বদ্ধতাই তাঁকে ত্রিপুরায় টেনে এনেছে।

ত্রিপুরার রাজদরবারে যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যের চর্চা হত তা রাজ দরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। তখনকার সময়ের সাধারণ মানুষেরা সঙ্গীতের সেই রসমাধুর্য থেকে বঞ্চিত ছিল। পুলিন ঠাকুরই সর্বপ্রথম সর্ব সাধারণের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচারের জন্য নিজের বাড়িতে 'বীরবিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। ১৯৫১ সালে সেই বিদ্যালয় কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস' নামে উমাকান্ত একাডেমীর পশ্চিমদিকের লাল দালান ও টিনের ঘরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৭ সালে কলেজটি 'ভাতখন্ড সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের' অনুমোদন পায় এবং ১৯৬৪ সালে 'সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়' নামে ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। পুলিন ঠাকুর এই কলেজে অধ্যাপনার কাজ করতেন এবং শেষের দিকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আপনভোলা ও উদাসীন প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং যথেষ্ট সুরুচি সম্পন্ন ছিলেন। ঝকঝকে পাম্প-সু ও ইস্ত্রি করা ধুতি পাঞ্জাবী পরে চলাফেরা করতে ভালবাসতেন। জীবনে দারিদ্র্যের কশাঘাত অনেক সহ্য করেছেন কিন্তু সঙ্গীত সাধনা থেকে সরে আসেননি। তিনি তাঁর ওস্তাদের কাছ থেকে পাওয়া তালিমের বাইরে যেতেন না। লক্ষ্ণৌতে থাকাকালীন সময়ে একটানা সাতবছর তিনি রাতে ইমনরাগ ও ভোরবেলা ভৈরবী রাগের সাধনা করে গেছেন। আসরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনের মুহূর্ত আগেও তিনি বলতে পারতেন না যে কী রাগ গাইবেন। তানপুরা মিলিয়ে আসরে বসার পর দু-চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ হতেন এবং তখনই রাগ নির্ণয় করে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তাঁর গায়ন কৌশল ছিল অনন্য এবং গেয় সঙ্গীতের সুরেলা মাধুর্য ছড়িয়ে তিনি গোটা রাজ্যের সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন।

পুলিন দেববর্মাকে এককথায় ত্রিপুরার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের পুরোধা বলা যায়। তিনি নিজে অর্থলাভ, যশলাভ ও খ্যাতির মোহ ছেড়ে সঙ্গীতকে সর্বজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দূরদর্শনের ও বেতারের অনুষ্ঠানের সুপ্রতিষ্ঠিত এই মহান শিল্পীর সুযোগ্য ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন — নৃপেন্দ্র চন্দ্র দে, ধীরেন্দ্র বণিক, রাজ্যেশ্বর বণিক, শিবেন্দ্র চক্রবর্তী, সত্যেন দাশ, বারীন দেববর্মা, রবি নাগ, আরতি কর, নারায়ণ দেববর্মা ও তারক রায় প্রমুখ।

ত্রিপুরার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পুলিন দেববর্মার অবদানকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় 'পুলিন দেববর্মা

স্মৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ' নামে ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করে আসছে। পুলিন দেববর্মা চাইতেন সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা উত্তরোত্তর বেড়ে উঠুক। বলা যায় তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বন্ধ দরজা আম-জনতার নিকট খুলে দিতে চেয়েছিলেন, তিনি জানতেন এই ধরণের সঙ্গীত সাধনা মানুষের জীবনের আধ্যাত্মিক দিককে যেমন উন্নত করতে পারে, পারে মানুষের অন্তরের পাশবিকতাকে নাশ করে সুকোমল বৃত্তিগুলোকে জাগাতে। তাঁর উৎসর্গীকৃত সাংগীতিক জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে নতুন প্রজন্ম শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে সাদরে গ্রহণ করুক এবং তাদের অন্তরের মহান বৃত্তিগুলোর সুপ্রকাশ ঘটুক তবেই তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

❄ ❄ ❄

বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে

শচীন দেববর্মন

বাংলার আবহমান সুর যিনি ভারতের সঙ্গীতাকাশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি ত্রিপুরার সুযোগ্য সন্তান মহারাজ কুমার শচীন দেববর্মন। ত্রিপুরার রাজপরিবারে ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর কুমিল্লায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নবদ্বীপ মহারাজ কুমার এবং মা মণিপুর রাজপরিবারের কন্যা নিরুপমা দেবী। পাঁচ ভাই চার বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট শচীন দেববর্মন। অভিজাত রাজ পরিবারের প্রাচুর্য্যের মধ্যে লালিত হলেও জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাটির টান অনুভব করে মাটির কোলে থাকতেই ভালবাসতেন। তাঁর খুব আপন লাগতো সহজ সরল মাটির মানুষকে। যদিও তাঁর এই আচরণ ও স্বভাব রাজ পরিবারের কেউ পছন্দ করতেন না।

কুমিল্লা শহরেই তাঁর ছোটবেলা কেটেছিল প্রথমে কিছুদিন ইউসুফ স্কুলে পড়েছিলেন, পরে ক্লাস ফাইভে উঠে কুমিল্লা জেলাস্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠানে বাবার শেখানো গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। নবদ্বীপ কর্তা চেয়েছিলেন ধ্রূপদ ও খেয়াল গায়ক শ্যামাচরণ দত্তের কাছে পুত্র গান শিখুক কিন্তু পুত্র রাজি হলেন না, পিতার কাছেই গান শেখা চলতে লাগলো। দূর থেকে ভাটিয়ালি সুর কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে তার পড়াশুনা ওলট-পালট করে দিত। যাই হোক ১৯২০ সালে ১৪ বৎসর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পাস করে ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হন-তবে কলেজের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে গ্রামে গ্রামে ভাটিয়ালি ও বাউল গায়কদের সাথে ঘুরে বেড়াতেন।

১৯২৩ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজেই বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন, সঙ্গে চলে গ্রামে গ্রামে বাংলা গানের অনুসন্ধান। চাষী-জেলেদের সঙ্গে, বাউল বৈষ্ণব ভাটিয়ালি গায়ক ও গাজন দলের সঙ্গে ছুটির ফাঁকে, কলেজ ফাঁকি দিয়ে সময় কাটাতেন গান গেয়ে। এই অঞ্চলের সব গ্রাম নদী তিনি চষে বেড়িয়েছেন আর সংগ্রহ করেছেন গান। এই সময়কার সংগ্রহ তার সারা জীবনের সম্পদ। ১৯২৪ সালে তিনি বি.এ. পাশ করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন কিন্তু তাঁর পড়াশুনা আর ভাল লাগছিল না, মন চাইছিল গানে ডুবে থাকতে - গান শিখতে। ১৯২৫ সালে কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কাছে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করলেন, তিনিই কোলকাতায় তাঁর প্রথম সঙ্গীত গুরু। এরপর পড়া ছেড়ে দিলেন। পিতা চাইলেন ছেলে আইন নিয়ে পড়াশুনা করুক, কিন্তু শচীন কর্তা নারাজ, ফলে পড়াশুনা বন্ধ করে ডুবে গেলেন সঙ্গীত সাধনায়।

কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে তাঁর গুরু ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে শিখলেন তবে ১৯৩৭ সালে বাদল খাঁর মৃত্যু হওয়ায় শচীন কর্তা তাঁকে বেশিদিন পান নি। কিছুদিন হারমোনিয়াম ও ঠুমরি বিশেষজ্ঞ শ্যামলাল ছেত্রীর কাছেও শিখেছেন। বেনারসী ঠুমরি আর ঠুমরির বোল বানাবার উপায় শিখেছিলেন। কোলকাতা থেকে বছরে কমকরেও তিনবার কুমিল্লা ও আগরতলায় আসতেন। ফকির বৈষ্ণবদের ডেকে এনে গান শুনতেন ও ভালো লাগলে কথা লিখে নিতেন, সুর তুলে নিতেন। সায়েব আলি নামে একজন ঘরামি লোকগানের ভান্ডারি ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে গান

লিখে নিয়ে তিনি পরে রেকর্ডও করেছেন। ১৯৩০ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তিনি নিঃসহায় হয়ে যান। দাদারা সবাই পরামর্শ দেন রাজবাড়িতে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত ভোগ সুখের জীবন যাপন করতে কিন্তু যিনি গানের ভুবনে পা দিয়েছেন তাঁর পক্ষে রাজবাড়িতে ফিরে নিশ্চিত জীবন যাপন করা সম্ভব নয় তাই আর ফেরা হল না। শুরু হল জীবন সংগ্রাম। বাড়ির সাহায্য ছাড়াই তিনি সঙ্গীত সাধনা বজায় রাখলেন টিউশনি করে, একখানা ভাড়া ঘরে থেকে। চললো রেওয়াজ, বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গ আর গান বাজনা। খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও তিনি সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

শচীন কর্তা যেমন দিনের পর দিন লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন, তেমনি বছরের পর বছর রাগ সঙ্গীতেও সেরা শিল্পীদের অধীনে তালিম নিয়েছেন ফলে লোকগীতি আর ধ্রূপদী গানের সার্থক যুগলবন্দি ঘটেছিল তাঁর গানে। কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর খুবই বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর অনেক গান শচীন কর্তা রেকর্ড করেছেন। ১৯৩২ সালের পর হিন্দুস্থান কোম্পানীতে শচীন কর্তার একটার পর একটা গান রেকর্ড হয়েছে। ১৯৩৪ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে অল ইন্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে তিনি আমন্ত্রিত হন এবং ঠুমরি ও বাংলা গান গেয়ে সকল শ্রোতার হৃদয়-মন জয় করেন। এখানেই ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ওস্তাদজি তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। পর পর তিনবার তিনি এখানে ডাক পেয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে কোলকাতা মিউজিক কন্‌ফারেন্সে ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁ সাহেবের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি পরিচয় হয়। তাঁর সামনেই তিনি ঠুমরি পরিবেশন করেছেন। ধীরে ধীরে শচীন কর্তার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে, রেডিওতে নিয়মিত গান গাইতে থাকেন, ছাত্র-ছাত্রীদের গান শিখিয়ে টাকা উপার্জন হতে থাকে। স্থাপন করেন সঙ্গীত শিক্ষার স্কুল - "সুর মন্দির"।

১৯৩৮ সালে ঢাকার জজ রায় বাহাদুর শ্রী কমলানাথ দাসগুপ্তের নাতনি মীরা দাসগুপ্তার সঙ্গে শচীন কর্তা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মীরা দেবী তাঁর ছাত্রী ছিলেন। তিনিও ছিলেন অত্যন্ত গুণী। নৃত্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত, কীর্তন, ঠুমরি, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ইত্যাদি সবকিছুর তালিম নিয়েছিলেন। তিনি রেডিও শিল্পী ছিলেন তাঁর বাংলা ও হিন্দী গানের রেকর্ডও প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া তিনি গীতিকার এবং সুরকার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আদর্শ-দম্পতি। মীরা দেবী কেবল সহধর্মিনীই নন। শচীন কর্তার সঙ্গীত জীবনের সাফল্যের পিছনে তাঁর সহযোগিতা, প্রেরণা, উৎসাহ ও আত্মত্যাগ ছিল। ১৯৩৯ সালে। তাঁদের একমাত্র সন্তান রাহুল জন্মগ্রহণ করে।

১৯৪৪ সালে শচীন দেববর্মন পাকাপাকিভাবে মুম্বাই চলে যান। সেখানে সিনেমার সঙ্গীত পরিচালক হয়ে চলে সুরের পরীক্ষা নীরিক্ষা। একটার পর একটা ছবির গান হিট্ হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে কালজয়ী সঙ্গীত। মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র জগতে তিন দশক ধরে তিনি রাজত্ব করেছেন। তাঁর সুরের জাদুতে মাতিয়ে রেখেছেন ত্রিপুরা, বাঙলা, মহারাষ্ট্র তথা পুরো ভারতবর্ষ। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী।

জীবনে দু'হাতে যেমন পয়সা উপার্জন করেছেন তেমনি অনেক পুরষ্কারও লাভ করেছেন। ১৯৫৩ সালে 'ট্যাক্সি ড্রাইভার' সিনেমার সুরকার হিসেবে 'ফিল্ম ফেয়ার' পুরস্কার পান। ১৯৫৮ সালে 'সঙ্গীত নাটক একাডেমি' পুরস্কার পান। ১৯৫৯ সালে 'পিয়াসা' ছবিতে সুরারোপের

জন্য 'এশিয়ান ফিল্ম সোসাইটি' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬২ সালে হেলসিঙ্কি, ফিনল্যান্ড আন্তর্জাতিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ছিলেন অন্যতম বিচারক।

১৯৬৩ সালে 'ত্রিপুরা ললিত কলা কেন্দ্র' কোলকাতায় শচীন কর্তাকে মানপত্র দান করেন।

১৯৬৪ সালে 'ক্যায়সে কঁহু' ছবিতে সুরারোপের জন্য 'সুর শৃঙ্গার সংসদ' তাঁকে 'সন্ত হরিদাস' পুরস্কার দান করে। ১৯৬৯ সালে ভারত সরকার 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে সম্মানীত করেন। ১৯৭৪ সালে 'অভিমান' সিনেমায় সুরারোপের জন্য আবার 'ফিল্ম ফেয়ার' পুরস্কার পান।

১৯৭৫ সালের ৩১ শে অক্টোবর তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। এখনো আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায় তাঁর ''তোরা কে যাস্‌রে ভাটি গাঙ্ বাইয়া'', ''আমি তাকডুম্ তাকডুম্ বাজাই' ইত্যাদি গানের সুর। তিনি বকুল বিছানো পথে যেতে যেতে ছড়িয়ে দিয়েছেন গানের ইন্দ্রধনু। সঙ্গীতের কিংবদন্তি পুরুষ, ত্রিপুরার সুযোগ্য পুত্র শচীন দেববর্মন আজো মানুষের হৃদয়ে জীবন্ত, চিরদিনই বেঁচে থাকবেন সুরের রাজাধিরাজ হয়ে।

ত্রিপুরায় তবলা বাদনে ও তবলা শিক্ষা প্রসারের প্রবাদপুরুষ পরম পূজনীয় ৺অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস মহোদয়ের জীবনপঞ্জী

শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস ইংরাজী ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তৎকালীন পূর্ব বাংলার (অধুনা স্বাধীন বাংলাদেশ) কুমিল্লা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কালিকচ্ছ গ্রামের মনিরবাগে এক সাংগীতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। উনার পিতা শশী মোহন বিশ্বাস, মাতা সুক্ষদা সুন্দরী বিশ্বাস। তিনি পিতা ও মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতা একজন বিশিষ্ট কীর্ত্তনীয়া ও খোল বাদক ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন বিশিষ্ট কবিরাজও ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস সংগীতের প্রতি খুব আকৃষ্ট ছিলেন। পিতার সঙ্গে ছোটবেলায় কীর্তন ও খোল বাজনায় তাঁর পারদর্শিতার প্রমাণ মেলে। সংগীতের প্রতি অনুরাগ ও আবেগ দেখে শশীবাবু তাঁকে উমেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে তবলা শিক্ষার জন্য পাঠান। শ্রী বিশ্বাস সেখানে আট-দশ বৎসর নিয়মিত তবলার তালিম নেন। উমেশ চন্দ্র চক্রবর্তী সে সময়ের লক্ষ্ণৌ ঘরাণার একজন বিখ্যাত তবলা ও পাখোয়াজ বাদক ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার রাজ দরবারের একজন নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে অশ্বিনী বিশ্বাস মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে কলকাতায় চলে যান তবলায় গভীর শিক্ষালাভ করার জন্য। তিনি কলকাতায় মুড়াপাড়ার জমিদার রায় বাহাদুর কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে দীর্ঘ কয়েক বৎসর তবলা শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময় বিখ্যাত তবলা বাদক কানাই দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। কলকাতা থাকার সময়ে তিনি বিখ্যাত সেতারী আলী আহমেদ খাঁ, গকুল নাগ (বিখ্যাত সেতারী মণিলাল নাগের পিতা) , অনাথ বসু, ভারতের বিখ্যাত সংগীত পরিচালক শচীন দেববর্মন, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, অমিয়মাধব রায় চৌধুরী (দাদাজী), ননী গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ফেরদৌসী বেগম (বিখ্যাত পল্লী গায়ক আব্বাসউদ্দীনের মেয়ে), বিনয় চৌধুরী প্রমুখদের সঙ্গে বহু সংগীত অনুষ্ঠানে তবলা সংগত করেন। তিনি ১৯৪৩ সালে মনোপ্রভা বিশ্বাসের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মনোপ্রভা বিশ্বাস একজন সংগীত প্রেমিক ছিলেন। তিনি গ্রাম্য লোক সংগীত ভাল গাইতেন এবং অশ্বিনী বাবুকে সংগীতের ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করতেন। মনোপ্রভা দেবী ১৯৯২ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস কলকাতা থাকার সময় ১৯৪৫ ইংরেজীতে Bengal Publicity – তে তবলার চাকুরী লাভ করেন। Bengal Publicity ছিল তৎকালীন Bengal Government – এর অধীনে। উনার কর্মস্থল হয় ময়মনসিংহে (বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশে)। সেই সময় উনার Unit – এ ছিলেন বিখ্যাত পল্লী কবি জসীমউদ্দীন, বিখ্যাত পল্লী সংগীত গায়ক আব্বাসউদ্দীন এবং আরেকজন বিখ্যাত পল্লী সংগীত গায়ক আবদুল হালিম চৌধুরী। উনাদের সঙ্গে বহু অনুষ্ঠানে তিনি তবলা শিল্পী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন সরকারী ও বে-সরকারী ভাবে। এই Unit – এর কাজ ছিল বিভিন্ন স্থানে সংগীতের অনুষ্ঠান করে পল্লী সংগীতের মাধ্যমে মানুষকে বিভিন্নভাবে শিক্ষিত করে তোলা।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ সালে শ্রী বিশ্বাস (ত্রিপুরায়) আগরতলা চলে আসেন।

১৯৫১ সালে পুলিন চন্দ্র দেববর্মন স্ব-পরিচালনায় আগরতলার উমাকান্ত একাডেমী স্কুলের এক অংশে একটি সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। যার নাম ছিল Collage of Music and Fine Arts। এই সংগীত শিক্ষাকেন্দ্রের স্থাপনকাল থেকে অশ্বিনী বাবু এখানে তবলা শিক্ষক ও তবলা বাদক হিসাবে কাজ করেন এবং এই কলেজের স্থাপকদের মধ্যে তিনি একজন।

সেই সময় এই কলেজে ত্রিপুরার হরিশংকর দেববর্মন-পাখোয়াজ ও তবলায়, হরিধন সাহা -তবলায় (হীরু সাহার বাবা), এসরাজে নৃপেন নাথ দে, গানে রাজেশ্বর বণিক, শিবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও মায়া দেব চৌধুরী এবং নাচের শিক্ষক ছিলেন সুরেনজিৎ সিংহ রাজকুমার।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে এই মহাবিদ্যালয়ে আসতেন ওস্তাদ আয়েতালী খাঁ সাহেব (যিনি বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ছোট ভাই),মানিক মিঞা (সেতার), গানে গজেন্দ্র রায়। এই শিল্পীগণ বেশ কিছুদিন এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে শ্রী বিশ্বাস বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তবলা শিল্পী হিসাবে সংগত করেন। তখনকার এই কলেজের অধ্যক্ষ পুলিন চন্দ্র দেববর্মনের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী সংগীত অনুষ্ঠানে তবলা সংগত করেন। পুলিন চন্দ্র দেববর্মনের জীবিতকাল পর্যন্ত এই তবলা সংগতের ধারা বজায় ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত শ্রী বিশ্বাস আগরতলার নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে তবলার শিক্ষক হিসাবে চাকুরী করেন। ১৯৫৭ সালে College of Music and Fine Arts কে ভাতখন্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ, লক্ষ্ণৌ, কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হয়। এর অধীনে পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন হয়। ১৯৫৯ সালে ভাতখন্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠের পরিচালিত পরীক্ষায় অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস প্রথম বিভাগে তবলায় বাদ্য বিশারদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই সময়ে আরতি কর (গানে), সত্যেন্দ্র নাথ দাস (গানে), হীরণ দেববর্মনের (পুলিন চন্দ্র দেববর্মনের ছোট ভাই) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংগীত কলেজের স্থাপনকাল থেকে সংগীতের কোন অনুষ্ঠান হলে তবলা বাদক হিসাবে অশ্বিনী বাবুর ডাক পড়ত এবং তিনি উক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে যোগদান করতেন। এই ধারা যতদিন তিনি চাকুরী করেছেন ততদিন পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত শ্রী বিশ্বাস মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে তবলা বাদক হিসাবে চাকুরী করেন। এই সংগীত মহাবিদ্যালয় ছাড়া ত্রিপুরার (আগরতলা উজির বাড়ি), অনিল সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুরেশ কৃষ্ণ দেববর্মন, লহরী দেববর্মন (নাদপীঠের অধ্যক্ষ,

সরোদ বাদক), ত্রিপুরার রাজ পরিবারের বিপিন কর্তা (বেহালা বাদক), বঙ্কিম কর্তা (এসরাজ বাদক), হেমন্ত কিশোর দেববর্মন (সেতার বাদক, সুগায়িকা ঋর্ণা দেববর্মনের বাবা), এঁদের সঙ্গে দীর্ঘদিন নিয়মিত তবলা সংগত করেছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। শ্রী বিশ্বাস বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সঙ্গে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে তবলা সংগত করেন ১৯৫৪ সালে। সেই বছর বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব ত্রিপুরার রাজবাড়িতেও সংগীত অনুষ্ঠান করেন, সেখানে অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস দক্ষতার সঙ্গে তবলা সংগত করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। তাছাড়া ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ'র (সরোদ) সঙ্গে নিপুণতার সঙ্গে তিনি তবলা সংগত করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি শ্রীযুক্ত রবি নাগ মশায়ের প্রতিষ্ঠিত "সংগীত ভারতী"তে (আগরতলা শিববাড়িতে) তবলার শিক্ষকতা করেন। কিছুকাল তিনি সেখানে ছিলেন। সঙ্গীতগুণী রবি নাগের সঙ্গেও দীর্ঘদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি তবলা সংগত করেন। সেই সময়ে আরতি কর, সত্যেন্দ্র নাথ দাশ, হীরেন দেববর্মন, বিভূতি দেববর্মন, নারায়ণ দেববর্মন, বারিন্দ্র দেববর্মন, রণজিত ঘোষ ও সাধন ভট্টাচার্য্য (দৃষ্টিহীন) এঁরা সকলেই বিশিষ্ট গায়ক ছিলেন। এঁদের সঙ্গে বিভিন্ন সংগীত অনুষ্ঠানে তিনি দীর্ঘদিন তবলা সংগত করেন।

তাছাড়া বিখ্যাত সেতার শিল্পী উৎপল কৃষ্ণ দেববর্মন, বিখ্যাত সরোদ শিল্পী অনাথ বন্ধু দেববর্মনের সঙ্গে বহুবার দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন সংগীত অনুষ্ঠানে বহুবছর তিনি তবলা সংগত করেন।

ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহের বাড়িতে যে সপ্তাহিক সংগীত অনুষ্ঠান হত সেই সংগীত অনুষ্ঠানে পুলিন চন্দ্র দেববর্মন ও অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে শ্রী বিশ্বাস তবলা সংগত করেছেন। সেই অনুষ্ঠানে বহু বহিরাগত শিল্পীও আসতেন। উনাদের সঙ্গে শ্রী বিশ্বাস দক্ষতার সঙ্গে তবলা সংগত করেছেন। যার পরিচালনায় থাকতেন হরিকর্তা মশায়। সেই অনুষ্ঠানে নিহারবাবু ও সুর্য্য চক্রবর্তী নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। উনারাও সংগীত শিল্পী ছিলেন। সেই সময় কোন সংগীত অনুষ্ঠান হলে অশ্বিনীবাবুকে ছাড়া এইসব অনুষ্ঠান কল্পনাও করা যেতনা।

ত্রিপুরায় রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী নরেন ঠাকুরের (যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে থেকে রবীন্দ্র সংগীত ও চিত্রকলা শিক্ষা করেন) সঙ্গেও শ্রী বিশ্বাস দীর্ঘদিন তবলা সংগত করেছেন। তাছাড়া রবীন্দ্র গবেষক ও রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী অমিয়মুকুল দে, ব্রজ গোপাল সিংহ, মধুছন্দা সুর, সেবিকা পাল প্রমুখ শিল্পীদের সঙ্গে বিভিন্ন সংগীত অনুষ্ঠানে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি তবলা সংগত করেন।

ঐতিহ্যবাহী কর্ণেল বাড়ির (রাজার কর্ণেল) সংগীত শিল্পী যতীশ ঠাকুরের (যিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন ছিলেন এবং রবীন্দ্র, নজরুল, পল্লী সংগীত, ঠুমরী, গজল, টপ্পা ও শাস্ত্রীয় সংগীত গাইতেন) সঙ্গেও বহুদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শ্রী বিশ্বাস তবলা সংগত করেন। তাছাড়া এসরাজ শিল্পী চিত্তরঞ্জন দেববর্মনের (যিনি দিল্লিতে All India Radio তে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত এসরাজ শিল্পী হিসাবে কাজ করেছেন) সঙ্গে শ্রী বিশ্বাস আগরতলার বিভিন্ন সংগীত অনুষ্ঠানে তবলা সংগত করে প্রশংসা অর্জন করেন।

কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের ডীন রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সঙ্গে বহুবার তিনি বিভিন্ন সংগীত অনুষ্ঠানে পাখোয়াজ ও তবলায় দক্ষতার সঙ্গে সংগত করেন। বিখ্যাত বেহালা বাদক পন্ডিত জে. এন. গোস্বামীর সঙ্গেও বিভিন্ন সংগীত অনুষ্ঠানে তবলা সংগত করেন (যিনি ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিকের বেহালার গুরু)। সে সময় বহিরাগত কোন সংগীত শিল্পী আগরতলায় এলে তবলা সংগত করার জন্য অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস মশায়ের নাম সর্বাগ্রে চলে আসত এবং কাউকে কোন অবস্থাতেই তিনি নিরাশ করতেন না। এটি ছিল তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। প্রত্যেকের সঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে তবলা সংগত করে তিনি ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। পার্শ্বনাথ বণিকের (বেহালা বাদক) গঠিত "শিল্প মন্দিরে" প্রতি বৃহস্পতিবার যে অনুষ্ঠান হত সেখানেও শ্রী বিশ্বাস নিয়মিত তবলা শিল্পী হিসাবে অংশগ্রহণ করতেন। আগরতলায় এই "শিল্প মন্দির" ছিল কাঁসারী পট্টীতে। এই শিল্প মন্দিরের অনুষ্ঠানে বিখ্যাত ঠুমরী এবং টপ্পা গায়ক কালি কুমার ভট্টাচার্য্য উপস্থিত থেকেও ঠুমরী, টপ্পা গান পরিবেশন করতেন। উনার সঙ্গেও শ্রী বিশ্বাস তবলা সংগত করতেন। কালি কুমার ভট্টাচার্য্য ছিলেন ভারতের বিখ্যাত গায়ক ওস্তাদ জামিরুউদ্দিন খাঁর ছাত্র। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকারের সমাজ শিক্ষা দপ্তর - এ S. E. W. হিসাবে শ্রী বিশ্বাস চাকুরী করেন। ১৯৬৪ সালের ১লা জুন যখন College of Music and Fine Arts – কে সরকার Govt. Music College এ রূপান্তর করেন তখন শ্রী বিশ্বাস তবলা শিক্ষক হিসাবে এই সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এই সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৭৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেন। এই দীর্ঘ চাকুরী জীবনে সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের যত অনুষ্ঠান হয়েছে, সমস্ত অনুষ্ঠানে তবলা শিল্পী হিসাবে তিনি যোগদান করেন। তখন এই সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ কুমুদ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (গানে) পুলিন চন্দ্র দেববর্মন, পরবর্তী অধ্যক্ষ P. N. Verbay ও তাঁর পত্নী মালতী পান্ডে, কণিকা চক্রবর্তী (দেববর্মন), গৌরী চক্রবর্তী, ঝর্ণা দেববর্মন, শুভ্রা দাস, সাধন ভট্টাচার্য্য প্রমুখদের সঙ্গে তবলা সংগত করে প্রশংসা অর্জন করেন। তিনি বহুবার তবলা লহরা পরিবেশন করেন দক্ষতার সঙ্গে এবং ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। কথক নৃত্যের শিক্ষক বিহার রঞ্জন সিংহের সঙ্গেও তিনি দক্ষতার সঙ্গে তবলা সংগত করেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। দীর্ঘদিন ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিকের বেহালার সঙ্গে বিভিন্ন সংগীত অনুষ্ঠানে শ্রী বিশ্বাস তবলা শিল্পী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। যখন ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন তখনও শ্রী বিশ্বাস বিভিন্ন সংগীত অনুষ্ঠানে উনার বেহালা বাজনার সাথে কৃতিত্বপূর্ণ তবলা সংগত করেন।

সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ পদ্মিনী চক্রবর্তী যখন College of Music and Fine Arts-এ কথক নৃত্যে শিখতেন তখন থেকে দীর্ঘদিন বিভিন্ন সংগীত অনুষ্ঠানে শ্রী বিশ্বাস ডঃ পদ্মিনী চক্রবর্তীর সঙ্গে কথক নৃত্যে তবলা সংগত করতেন। সুরেনজিত সিংহ রাজকুমার ছিলেন শ্রীমতী চক্রবর্তীর নৃত্য গুরু। সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণ করার পর শ্রী বিশ্বাস তাঁর পরিচালনায় নিজ বাড়িতে একটি সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন — যার নাম 'শশী কলা কেন্দ্র' (রামনগর রোড নং - ১০, আগরতলা)। সিধাই মোহনপুরেও তিনি একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও পরিচালনা করেন। খোয়াই মহকুমা

ও জিরানিয়ার সংগীত বিদ্যালয়গুলিতে তিনি তবলার শিক্ষকতা করেন। শ্রী বিশ্বাসের শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন সচ্চিদানন্দ হালদার (যিনি সংগীত বিতানের প্রতিষ্ঠাতা), ফণী গোপাল ভট্টাচার্য্য, পিনাক পানি গুপ্ত, প্রদ্যেৎ (বাবুল) ভট্টাচার্য্য, বীরেন রায়, গৌরাঙ্গ শীল, প্রিয়লাল লস্কর (উদয়পুর), মানিক সরকার (বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী), গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস (শ্রী বিশ্বাসের বড় ছেলে) লক্ষ্মীকান্ত সরকার, ধীরেন্দ্র চৌধুরী, প্রিয়নাথ মজুমদার, মণীন্দ্র চন্দ্র দাস, হারাধন চৌধুরী, মঙ্গল ঋষিদাস, ব্রজহরি দেবনাথ, শ্রীমতী হাসি রানী শর্মা, রণজয় দেব চৌধুরী, চন্দন ভৌমিক, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ রায়, অমল দে, চয়নমনি চক্রবর্তী, প্রশান্ত দেববর্মন, নন্দন আচার্য্য, সুবল বিশ্বাস ও উৎপল বিশ্বাস (পুত্রদ্বয়)। এঁরা সকলেই তবলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। উনার ছেলে মেয়ে এবং পরবর্তী বংশধরেরাও সংগীত চর্চায় রত।

দু'হাজার পাঁচ সালের একুশে নভেম্বর, এই মহান শিল্পীর দেহান্ত হয়।

ওস্তাদ আলি আকবর খানের প্রয়াণে 'সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে' আয়োজিত শোকসভায় গৃহীত শোকলিপি ঃ-

ভারতীয় সঙ্গীতাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রপতন ঘটল ১৮ই জুন, বৃহস্পতিবার। প্রয়াত হলেন ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব, মাইহার ও সেনী ঘরানার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, প্রবাদ প্রতিম সরোদ শিল্পী ওস্তাদ আলি আকবর খান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। এই বিশ্ববরেণ্য শিল্পীর প্রয়াণে কেবল সঙ্গীত জগৎই নয়, শোকস্তব্ধ সমস্ত পৃথিবীবাসী।

ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের কিংবদন্তি পুরুষ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান ও মদিনা বিবির একমাত্র পুত্র ওস্তাদ আলি আকবর খান বর্তমান বাংলাদেশের অর্ন্তগত কুমিল্লা জেলার শিবপুর গ্রামে ১৯২২ সালের ১৪ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। এই বিশ্ববরেণ্য শিল্পীকে ত্রিপুরার সন্তান হিসেবেও অভিহিত করা যায় কারণ তাঁর জন্মগ্রাম শিবপুর ছিল ত্রিপুরার মহারাজদের জমিদারীর অংশ।

সেই সূত্রে ত্রিপুরার রাজদরবারের সঙ্গে তাঁর পরিবারের যোগাযোগ ছিল। কেবল পিতা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানই নন, জ্যেঠামশায় আফতাব উদ্দিন ও কাকা বিশিষ্ট সেতারী আয়েত আলি খানও অনেকবার আগরতলায় এসেছেন। তিনিও সম্ভবতঃ একবারই আগরতলায় এসেছিলেন।

ওস্তাদ আলি আকবর খান তিনবার দার পরিগ্রহ করেছেন। তাঁর এগারজন সন্তান-সন্ততির মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নামী সরোদিয়া আশীষ খান। অন্যপুত্রদের মধ্যে ধ্যানেশ খান অকাল প্রয়াত, প্রানেশ খান ও পরমেশ খান কোলকাতা নিবাসী। কনিষ্ঠ পুত্র আলম খান খুবই সম্ভাবনাময় সরোদ শিল্পী। তিনি সর্বক্ষণ পিতার সঙ্গী ছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী মেরি ও পুত্র আশীষ খান ও আলম খান তাঁর সামনে ছিলেন।

মাত্র তিন বৎসর বয়সে তাঁর সঙ্গীতে হাতে খড়ি হয়। পিতা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে মাইহারে প্রতিষ্ঠিত হলেও পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গ্রামে। ফলে জ্যোঠামশায় ও কাকাই আলি

আকবরকে প্রাথমিক তালিম দিয়েছেন। বেহালা, সেতার ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রে পরিচয় করিয়েছেন ধ্রুপদ ধামার খেয়ালের সঙ্গে। পরে অবশ্য ফিরে যান পিতার কাছে মাইহারে। পিতা প্রথমেই ধরিয়ে দেন সুরশৃঙ্গার ও রবাব, তারপর সরোদ। শেষে স্থির করেন সরোদই হবে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তারপর পিতার কাছে শুরু হয় আলি আকবরের কঠোর সাধনা। পিতার তত্ত্বাবধানে চলতো দৈনিক ১৮ঘন্টার রেওয়াজ। একটু আনমনা হলেই কঠোর শাস্তি। পরে তাঁর শিক্ষাসঙ্গী হন পিতার অন্যতম সুযোগ্য শিষ্য আরেক কিংবদন্তি সেতার শিল্পী পন্ডিত রবিশঙ্কর। দু'জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুএবং আত্মীয় ছিলেন। বিখ্যাত সেতার শিল্পী বোন অন্নপূর্ণা ছিলেন রবিশঙ্করের প্রথমা স্ত্রী।

মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে এলাহাবাদের অনুষ্ঠানে প্রথম সরোদ বাজান এবং শ্রোতারা বুঝে যান যে মহান পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী তিনি। ১৯৪৩ সালে যোধপুর রাজ দরবারের শিল্পী হিসেবে নিযুক্ত হন। তার আগে তিনি লক্ষ্ণৌ আকাশবাণীতে সরোদ শিল্পী হিসেবে যোগদান করেছিলেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও বাজানো চলেছে সমানতালে - কখনো একা, কখনো পিতার সঙ্গে কখনো বন্ধু রবিশঙ্করের সঙ্গে। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন। ১৯৫০ সালে ইহুদি মেনুহিন ও এশিয়াটিক সোসাইটির আমন্ত্রণে আমেরিকায় গিয়ে সরোদ বাজিয়ে বিদেশী শ্রোতাদের মোহিত করেন।

দেশে-বিদেশে তিনি অজস্র অনুষ্ঠান করেছেন। তিনি অনেক যুগলবন্দির অনুষ্ঠান করেছেন। পন্ডিত রবিশঙ্কর, নিখিল ব্যানার্জী ও ওস্তাদ বিলায়েত খানের সঙ্গে সেতার-সরোদ যুগলবন্দি, এল, সুব্রনিয়ামের সঙ্গে বেহালা সরোদ এর যুগলবন্দি বাজিয়েছেন নানা অনুষ্ঠানে। তবে ১৯৮৫ সালে ওয়াশিংটন কেনেডি সেন্টারে রাজীব গান্ধীর আপ্যায়নে পন্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে যে সেতার সরোদের যুগলবন্দি বাজান তা সর্বকালের সেরা। পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্পী বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, রিংগো ষ্টারর্-এর সঙ্গেও বাজিয়েছিলেন। জন হেডলির স্যাক্সোফোনের সঙ্গেও তিনি সরোদ বাজিয়ে ছিলেন। ১৯৫০ এর দশকে আমেরিকার বিখ্যাত টিভি অনুষ্ঠান অ্যলিষ্টার কুকের 'ওমনিবাস'-এ তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পী।

দেশে বিদেশে তাঁর সরোদ বাদনের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। সেতার সরোদের যুগলবন্দির রেকর্ড খুব জনপ্রিয় হয়। ১৯৫৫ সালে ইহুদি মেনুহিনের ভূমিকা সহ তাঁর সরোদ বাদনের এল.পি. প্রকাশিত হয় -যা বিশ্বের বাজারে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি চলচ্চিত্রেও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। তাঁর প্রথম সুর দেওয়া ছবি চেতন আনন্দের 'আধিয়ান' (হিন্দী)। সত্যজিত রায়ের 'দেবী' ও তপন সিংহের 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। বার্নাডো বার্তালুচ্চির ইংরেজি ছবি 'লিটল বুদ্ধ' তেও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। তিনি অনেক নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর মধ্যে চন্দ্রনন্দন, লাজবন্তী, গৌরীমঞ্জরী, মাধবী, মধু-মালতি, নন্দিনী উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৫৬ সালে কোলকাতায় এবং ১৯৫৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে স্থাপন করেন "আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিক"। ১৯৮৫ তে সুইজারল্যান্ডের বাসেলে তিনি ঐ স্কুলের একটি শাখা স্থাপন করেন। প্রচুর বিদেশি

ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিষ্ঠানে সেতার, সরোদ, তবলা ইত্যাদি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের তালিম নিচ্ছেন। আমেরিকার সান রাফেলে স্কুল খোলার পরেই তিনি আমেরিকা প্রবাসী হন। তবে ভারতে তার আসা-যাওয়া অব্যাহত ছিল।

এই মহান ধ্রুপদী শিল্পীর সঙ্গীত জগতে অসামান্য অবদানের জন্য দেশে বিদেশে নানা পুরস্কারে তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ এবং পরে পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করে। বিশ্বভারতী থেকে তাঁকে দেওয়া হয় 'দেশিকোত্তম' উপাধি। ১৯৯১ সালে 'ম্যাক আর্থার জিনিয়াস গ্র্যান্ট' পুরস্কার পান। ন্যাশনাল এনোমেন্ট ফর দি আর্টস এর সম্মান জনক 'হেরিটেজ ফেলোশিপ' পান যা আমেরিকার ট্রাডিশনাল আর্ট-এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মান। ১৯৭০ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে পাঁচবার গ্র্যামি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন। পিতা তাঁকে দিয়েছেন 'সুর সম্রাট' 'খেতাব'। ইহুদি মেনুহিন বলেছেন 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী'। অনুগামীদের কাছে তিনি 'সরস্বতীর বরপুত্র' হিসেবে পরিচিতি 'খান সাহেব' নামে আর সঙ্গীত জগৎ তাঁকে মেনে নিয়েছে।

এই সরোদ সম্রাট কয়েক বছর ধরেই কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। শেষ কয়েকটা দিন গভীর কোমায় অচ্ছন্ন ছিলেন। ১৮ই জুন সান রাফেলের বাড়ীতে আমেরিকার সময় রাত দশটায় তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হন। তাঁর প্রয়াণে সঙ্গীত জগতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হবার নয়। তাঁর দৈহিক মৃত্যু হয়েছে ঠিকই কিন্তু তিনি বেঁচে থাকবেন সঙ্গীতে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্য দিয়ে, তাঁর সৃষ্ট রাগের মধ্য দিয়ে, বেঁচে থাকবেন পৃথিবীর আকাশে বাতাসে সুরের যে জাল বুনেছিলেন তার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —

আকাশ জুড়ে শুনিনু
ওই বাজে ওই বাজে
তোমারি নাম
সকল তারার মাঝে
ওই বাজে ওই বাজে

এই নাম চিরকাল অনুরণিত হবে আমাদের মনে, আমাদের প্রাণে।

একটি কাল্পনিক কথোপকথন

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

ব্রজ ঃ কি ভাবে দেবমূর্তি প্রস্তুত করব যাতে সঠিকভাবে দেবত্ব ফুটে উঠে?

মার্কন্ডেয় ঃ যে চিত্রসূত্র জানে না সে কি ভাবে প্রতিমা নির্মাণের নিয়মগুলো জানবে?

বজ্র ঃ তাহলে আমাকে চিত্রসূত্র ব্যাখ্যা করুন যাতে আমি প্রতিমা লক্ষণ ভালভাবে বুঝতে পারি।

মার্কন্ডেয় ঃ নৃত্যশাস্ত্রের নিয়মবিধি না জানলে চিত্রসূত্রের কৃৎকৌশল ভালভাবে আয়ত্ব করা যায় না। কারণ, এ দুটি বিদ্যাতেই লোকজীবন প্রতিফলিত হয়।

বজ্র ঃ তাহলে আমাকে নৃত্যশাস্ত্রের নিয়মগুলি আগে ব্যাখ্যা করুন, কারণ, যে নৃত্যের নিয়ম জানে সে চিত্রবিধিও জানে।

মার্কন্ডেয় ঃ কিন্তু নৃত্যশাস্ত্রের নিয়ম জানতে হলে আগে যন্ত্রসংগীতের ধারণা থাকা চাই।

বজ্র ঃ তাহলে আগে যন্ত্র সঙ্গীত বুঝিয়ে দিন, তারপর নৃত্য, তারপর চিত্রবিদ্যা।

মার্কন্ডেয় ঃ কিন্তু কণ্ঠসংগীত না জানলে যন্ত্র সংগীত বুঝা যাবে না।

বজ্র ঃ তাহলে আমাকে কণ্ঠসংগীত ব্যাখ্যা করুন, কারণ কণ্ঠসংগীত জানলে সবই জানা যাবে।

মার্কন্ডেয় ঃ কণ্ঠসংগীত বুঝতে হলে গদ্য ও পদ্যের উচ্চারণরীতি বুঝতে হবে।

এভাবেই আলাপচারিতা কথোপকথন, বাদ-বিসংবাদ বা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে প্রাচীন ভারতে বিদ্যাচর্চার আদান প্রদান হতো। উদ্ধৃত কথোপকথনটি গুরু মার্কন্ডেয় ও শিষ্য বজ্রের । এটি বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের অন্তর্গত। এক সময় বিষ্ণুপুরাণের অংশবিশেষ হিসাবে বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থখানি বিবেচিত হতো। সতেরো হাজার সংস্কৃত শ্লোকে রচিত এ পুরাণটি আনুমানিক সপ্তম শতকের রচনা।

উল্লেখিত আলাপচারিতা থেকে বুঝা যায়, কোন বিদ্যাচর্চাই একান্ত নিরঙ্কুশ নয়। বিদ্যার একটি শাখার সঙ্গে অন্য শাখার সম্পর্ক রয়েছে। ভাস্কর্য বা মূর্তি বিদ্যা জানতে হলে শেষ পর্যন্ত শব্দশাস্ত্রের নিয়মও বুঝে নিতে হবে। সঙ্গীত শিখতে হলে বা বুঝতে হলে শারীর বিদ্যার জ্ঞানও প্রয়োজন। 'সঙ্গীতরত্নাকর' বইটির প্রারম্ভিক অধ্যায় কয়েকটি পড়লে মনে হয় জীবনবিজ্ঞান বিষয়ের শারীর বিদ্যার পাঠ্যবই হাতে উঠে এসেছে। এ সব বইতো অনেক পরবর্তী কালের। আজ থেকে চার পাঁচ হাজার বছর আগে যে সব বই সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষায় লেখা হয়েছে তা নানা বিষয়ে। সঙ্গীত শাস্ত্রের উদ্ভবতো সেই সামবেদের কালে। 'গীতিই সাম' এমন কথা প্রচলিত আছে।

আবার সামবেদের সংকলক বা ব্যাখ্যাকারগণও সে- সময় প্রচলিত নানা রীতির প্রাচীনতর গানগুলিকে বিশ্লেষণ করে মান্য গায়নরীতি প্রস্তুত করেছেন। গানকে ভাগ করেছেন গ্রামগেয় ও অরণ্যগেয়, ঊহ ও ঊহ্য - এ রকম নানা রূপে। সঙ্গীত বিষয়ক মূল সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি পড়বার বা পড়াবার লোকজন এখন বিরল। ভাতখন্ডেজি, বিঠ্ঠল ভাই, সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর বা প্রজ্ঞানানন্দ-র লেখা বইগুলি পড়লে বুঝা যায়, প্রাচীন সাহিত্যকে তাঁরা কতো নিবিড় ভাবে পড়েছেন।

আরেকটি বিষয় পরিস্কার। সেই প্রাচীন কাল থেকে প্রায়োগিক ও ঔপপত্তিক দুটি শাখাতে সমান গুরুত্ব ছিল। বেদের সময় কেমন গান গাওয়া হতো তার প্রায়োগিক পরিচয় সবকিছু দেয়া এখন আর সম্ভব নয়। ঔপপত্তিক বিষয়গুলি নানা গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে। এতে কিছুটা ধারণা হতে পারে। আর এসব ক্ষেত্রে, বজ্র মার্কন্ডেয়র আলাপচারিতার মতো অদ্ভুৎ উপস্থাপনগুলি কিছুটা হলেও কৌতুহলের সঞ্চার করে।

❋ ❋ ❋

রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম

— শুক্লা ভট্টাচার্য

'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

এই কাব্যপংক্তির মধ্যে নিহিত ভাবনাই রবীন্দ্র দর্শনের মূল ভিত্তি।

সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনায় বা বলা যেতে পারে জীবন সাধনায় মনকে সকল প্রকার অন্ধ বিশ্বাসের হাত থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের বঙ্গদেশে সার্বিক নবজাগরণের চরিত্র বিচার প্রসঙ্গে তিনি যে সব কথা বলেছেন, তা থেকে বোঝা যায় 'জাগরণ' বলতে তিনি মনে করতেন মানুষের বুদ্ধির জাগরণ, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ নিষেধের শাসন থেকে মুক্তি, অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তি। কবি বিশ্বাস করতেন, মুক্তিকে স্বীকার করার মধ্যেই গৌরব আর অস্বীকার করাই মূঢ়তার প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণকালীন অভিজ্ঞতা তাঁর মনের ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন তৃতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ করেন তখন 'পথের সঞ্চয়' পত্রে কবি বলেছেন 'বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে এবং সে আত্মা দুর্বল নহে। য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, 'যাহা আনন্দ' (যাত্রার পূর্বপত্র)।

পাশ্চাত্য জীবনের আনন্দকে রবীন্দ্রনাথ 'জঙ্গমশক্তি' রূপে দেখেছেন ও মুগ্ধ হয়েছেন। এই জঙ্গমশক্তি ও গতিবাদ পাশ্চাত্যের তীব্র গভীর জীবনপিপাসার পরিচয়বাহী। প্রাচ্যের যে গতিতত্ত্ব তা পাশ্চাত্যের বিপরীত। অর্থাৎ ভারতবর্ষের গতি মুক্তির পথে, জীবন তার কাছে মায়াময়।

কিন্তু পাশ্চাত্যের গতি হল প্রবল প্রাণশক্তি বিকাশের ও সম্ভোগের পথে, জীবন তার কাছে সত্য।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যে এই গতিবাদ বাণীরূপ লাভ করেছে। ইউরোপ সম্পর্কে যে বিরোধিতা তার 'স্বদেশ' 'ধর্ম' ইত্যাদি নানা লেখায় দেখা যায় কিন্তু পরবর্তীকালে বলাকা কাব্যে দেখি মানবমুখী জীবনবোধের প্রতিষ্ঠা। ইউরোপের গতিশীল জীবন তথা মানুষকে দেখে রবীন্দ্রনাথ পুরানো আর্যধর্মের রীতিনীতির বেড়া ভেঙ্গে মানবতাকে গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম ও বিশ্বমৈত্রীবোধ নিবিড়ভাবে যুক্ত। তাঁর মতে, ঐক্যের উপলব্ধিই মনুষ্যত্ব। মহাপুরুষ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যাঁরা অনৈক্য ও বিভেদ, সংকীর্ণতা ও জড়তা থেকে আমাদের মুক্তি দেন। বুদ্ধদেব থেকে রামমোহন পর্যন্ত সব মহামানবের ধারা পর্যালোচনা করে কবি এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন "বুদ্ধদেব জাতিধর্ম ও শাস্ত্রের সমস্ত ভাগ বিভাগ অতিক্রম করে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন সে হচ্ছে অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তি"। (ভারতপথিক রামমোহন)

এই মৈত্রী সাধনায় যে সব মহাপুরুষ আত্মনিয়োগ করেছিলেন যেমন চৈতন্যদেব, কবীর, দাদু, নানক, তুকারাম প্রমুখ মধ্যযুগীয় ভারতীয় সন্তদের কথা রবীন্দ্রনাথ যেমন বার বার আলোচনা করেছেন তেমনি তাদের মুক্তিদাতা বলেও অভিহিত করেছেন।

আধুনিক কালের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ এমন একজন পুরুষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যিনি ঐক্যবোধ তথা বিশ্বমৈত্রীবোধে ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ 'ভারত পথিক' বলে উল্লেখ করেছেন আর বিশ্বপথিক রূপেও কল্পনা করেছেন। সতেরো আঠোরো দশকে আমাদের ধর্মের নিঃসাড় প্রাণহীন অবস্থা দেখা গিয়েছিল। অন্ধ কুসংস্কারে ভারতীয়দের মন ছিল আচ্ছন্ন, সত্যকে মেনে নিতে আমরা দ্বিধা করেছিলাম, এই অবস্থায় রামমোহন রায় এসেছিলেন, তিনি বেদ-উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করলেন এবং ধর্মরক্ষক হিসাবে যারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে হিন্দু, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে ঐক্যবাণী উদ্ধার করলেন আর পাশ্চাত্য জগতের দিকে সহযোগিতার উদার নিমন্ত্রণ পাঠালেন, এই জন্যই রামমোহন রায় আধুনিক ভারতের মুক্তিদাতা। (দ্রঃ রবীন্দ্রনাথের 'ভারত পথিক রামমোহন')।

ইউরোপ থেকে মানবমুক্তিবাদী ও বিশ্বমৈত্রী মন্ত্রটি উনিশ শতকের সমাজ সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল। রামমোহনের পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের হাত পরে বিশ্বমৈত্রীবোধের ভিত্তি বাংলার মননে আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। পুরনো মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে নতুন মূল্যবোধকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পূর্বজদের এই সাধনাকে সংহত রূপদান করেছিলেন।

জীবনধারার কোন এক পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মনে করতেন চিরপুরাতন ভারতবর্ষের উপাসনায় আমাদের মুক্তি। 'স্বদেশ' প্রবন্ধ গ্রন্থে (১৯০৮) তিনি বলেছিলেন, "অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব"। (১৯০৮, নববর্ষ, স্বদেশ)।

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম কবি গঠন করেছিলেন তা একদা বিশ্বভারতীতে পরিণত হল। তা বাঙালীর নয়, হিন্দুর নয়, তপোবনের নয়, তা বিশ্বের — তা আধুনিক কালের। বিশ্বভারতীতে বিশ্ব এসে একত্র নীড় বাঁধলো — রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলো।

বিশ্বমানবতাবোধের পথে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে এই পর্বেই। বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ মিলনের আবশ্যকতা তিনি ঐ সময়েই উপলব্ধি করেছিলেন। বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে কবির মেলবন্ধনেই ঘটেছিল তার মুক্তি, চল্লিশ থেকে সত্তর — এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নিজেকে বারবার অতিক্রম করেছেন, বৃহৎ থেকে বৃহত্তরে যাত্রা করেছেন। প্রথম যৌবনের জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম, তারপর উপনিষদবাদ, তারপর তপোবন ও আনন্দবাদ, ব্রহ্মোপাসনা, জীবন ও কর্মে ব্রহ্ম উপলব্ধির সাধনা সবই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন, শেষ পর্যন্ত মানব ঐক্যবোধে উপনীত হয়েছেন। সত্যের রূপ ও প্রেরণা বারবার পরিবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবতায় পৌঁছেছে — রবীন্দ্রনাথের এই শেষ ও সর্বোত্তম সত্যোপলব্ধি হল মানবধর্ম।

কবিতা

নূতন ঠিকানা

মৃণাল রায়

নূতন জায়গা
নূতন প্রাণ
লিচু বাগানে
হল স্থান।।

মিউজিক কলেজে
সুরের খেলা
ছাত্র ছাত্রীদের
হল মেলা।।

নীল আকাশ
সবুজ গাছ
চারিদিকে যেন
পাখির বাস।।

সেতার সরোদের
যুগলবন্দি
তবলায় আনে যে প্রাণ
গানে আর নাচে
ভরে উঠে মন
বেড়ে যায় কলেজের সুনাম।

সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অতীত ও বর্তমান

মৃণাল রায়

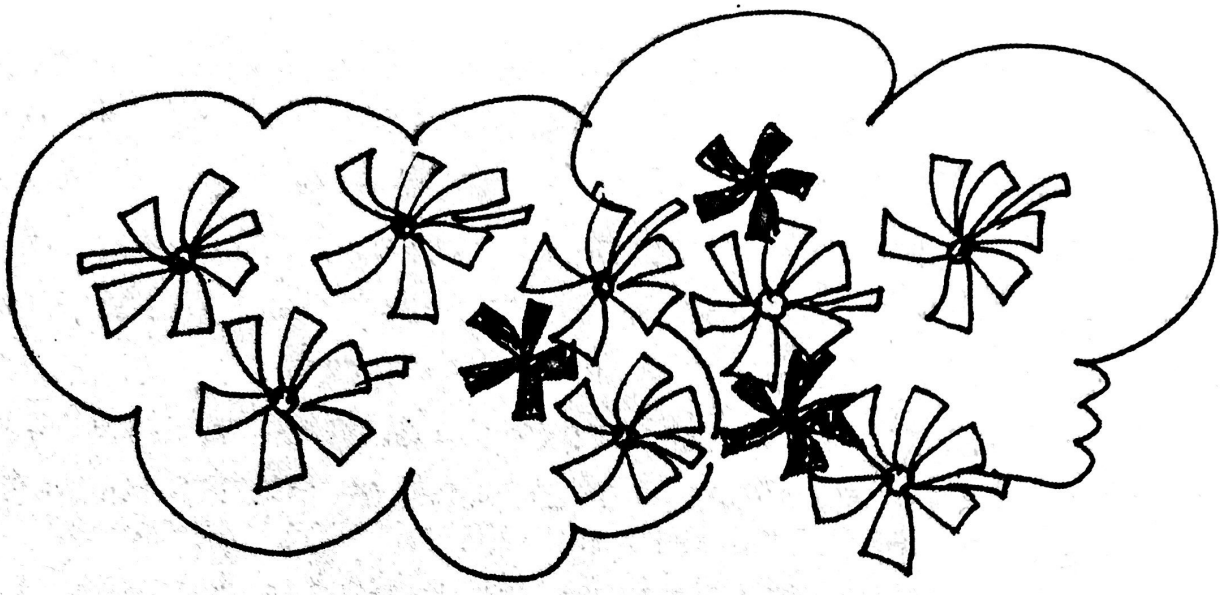

১লা জুন, শনিবার ১৯৬৪ সাল, ভি.এম. চৌমুহনীর উত্তরপূর্ব কোণে প্রায় ৬৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। প্রথম অধ্যক্ষ কুমুদ রঞ্জন ব্যানার্জি, আর ঁপুলিন চন্দ্র দেববর্মা ছিলেন সিনিয়ার লেকচারার। ১২জন ইনষ্ট্রাকটার, ৫জন একম্পেনিষ্ট নিয়োগ করা হয়। এখন একটুকু পিছনে ফিরে যাই। বর্তমান সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ঁপুলিন চন্দ্র দেববর্মা মহাশয় লক্ষ্ণৌ থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করে ভারতের নানা স্থানে অনুষ্ঠান করে সুনাম অর্জন করেছেন। কিছু সময়কাল পরে নিজের মাতৃভূমির ঋণের জন্য আগরতলায় (ত্রিপুরায়) ফিরে এসে নিজ বাড়ীতে প্রথম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। যার নাম ছিল 'বীরবিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়।' একে একে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি ভেবেছিলেন ত্রিপুরার সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের জন্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রসার একটি বিরাট মাধ্যম। তারপর ১৯৬১ সালে উমাকান্ত স্কুলের মাঠের পশ্চিমদিকের দালান বাড়ীতে টিনের ঘরে বীরবিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়ের স্থানান্তর হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস।' ধীরে ধীরে ছাত্র সংখ্যা আরোও বৃদ্ধি পেতে লাগল। ত্রিপুরা সরকারের নজর পড়ল এই কলেজের দিকে। ১৯৬৪ সালে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের নামে এই কলেজ নতুন জায়গায় স্থানান্তর হল। তারপর গুটিগুটি পায়ে শহরের কেন্দ্রস্থলে ৪৫ বৎসর কেটে গেল শহরের প্রানকেন্দ্র ভি.এম. চৌমুহনীতে ।

২০০৯ সালের মার্চ মাসে আবার মহাবিদ্যালয়ের স্থানান্তর হয়ে নতুন ঠিকানায় নতুন ভাবে লিচুবাগানে মহাবিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়।

সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে প্রথমে ভাতখন্ড বিদ্যাপীঠ (লক্ষ্ণৌ) এর অধীনে বিশারদ কোর্স করানো হত। তারপর ১৯৭৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেচেলার অব মিউজিক (বি.মিউজিক) ২ বৎসরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোর্স আরম্ভ হয়। একে একে ক্লাস

চলতে থাকে। বহু গুণী শিল্পী এই কলেজ থেকে পাশ করে আজ নিজের গুণে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৮৭ সালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক স্তরে ২ বৎসরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্লাশ প্রথম শুরু হয়। কলেজের ২টি বিভাগ চলতে থাকে। সকাল ১০টা থেকে ৩টা পর্যন্ত বি.মিউজিক কোর্স। আর ৩টা থেকে রাত্র ৯টা পর্যন্ত ভাতখন্ড বিদ্যাপীঠের কোর্স। ১৯৯৭-৯৮ সালে নতুন কিছু কোর্স যেমন - সেতার, সরোদ, তবলা এবং নৃত্য (ভরতনাট্যম, কত্থক, মণিপুরি) পড়ানোর জন্য ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির অনুমোদন ছিল। ২০০০ সালে এই কলেজকে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি স্থায়ীভাবে এফিলিয়েশন দিয়েছিল। ২০০২-০৩ সালে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে প্রথম চালু হল ৩ বৎসরের বি.মিউজ অনার্স কোর্স।

২০০৪-০৫ সালে নতুন করে কলেজে চালু হল রবীন্দ্র সঙ্গীতে ৩ বৎসরের বি.মিউজিক অনার্স কোর্স। বর্তমানে কলেজে রয়েছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, তবলা, সেতার, সরোদ, নৃত্য (ভরতনাট্টম, মণিপুরি, কত্থক) বিষয়ক ৩ বৎসরের বি.মিউজিক অনার্স কোর্স। তাছাড়া ২০০৯ সালের ২৮ শে জুলাই থেকে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি (সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি) চালু করেছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, কত্থক নৃত্য বিষয়ক মাষ্টার অব মিউজিক (এম.মিউজিক) কোর্স। তাছাড়া আগামী বছরে এই সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে শুরু হবে ডিপ্লোমা ইন মিউজিক কোর্স।

পঠন-পাঠন ছাড়াও সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন সারা বছরই মুখর থাকে নানা অনুষ্ঠান, সেমিনার ও ওয়ার্কসপের কর্মকান্ডে। বহু বছর ধরে ভাতখন্ডে আর পালুস্করের জন্মদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। গত কয়েক বছর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বসন্ত বন্দনা, ভাষা বন্দনা, বর্ষা বন্দনা ও অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলন।

গুণী শিল্পীরা ভারতের নানা স্থান থেকে এসে আমাদের কলেজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন —

ক)	শ্রী শঙ্কর লাল মুখার্জী	ঃ	ভরতনাট্যম, কত্থক, মণিপরী, রবীন্দ্রনৃত্য
খ)	পঃ অজয় চক্রবর্তী	ঃ	উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত
গ)	শ্রীমতী ইন্দ্রানী রায়	ঃ	কত্থক নৃত্য
ঘ)	শ্রী স্বপন ঘোষ	ঃ	পাখোয়াজ
ঙ)	আক্রাম খাঁ	ঃ	তবলা
চ)	পঃ যশরাজ	ঃ	কণ্ঠসঙ্গীত
ছ)	পঃ শ্যামল লাহিড়ী	ঃ	কণ্ঠসঙ্গীত
জ)	শ্রী তিমির রায় চৌধুরী	ঃ	তবলা
ঝ)	পঃ ভজন সুপুরী	ঃ	সন্তুর
ঞ)	পঃ শিবকুমার শর্মা	ঃ	সন্তুর
ট)	পঃ বিশ্বমোহন ভাট	ঃ	(মোহনবীণা)
ঠ)	পঃ রুনু মজুমদার	ঃ	বাঁশী
ড)	শ্রী স্বর্ণময় ভট্টাচার্য্য	ঃ	কণ্ঠসঙ্গীত (বাংলাদেশ)

ঢ)	শ্রীমতী অমিতা দত্ত	ঃ	কত্থক
ণ)	শ্রীমতী ইন্দ্রানী ঘোষ	ঃ	রবীন্দ্র সঙ্গীত
ত)	শ্রীমতী তিজনবাঈ	ঃ	লোকসঙ্গীত
থ)	শ্রী পরমানন্দ যাদব	ঃ	উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত
দ)	শ্রী অরুণ ভাদুড়ী	ঃ	উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত
ধ)	শ্রী মনোজিৎ মল্লিক	ঃ	উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত
ন)	শ্রী বিমল রায়	ঃ	তবলা

কলেজে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত আছেন রাজ্যের প্রথিতযশা একগুচ্ছ শিল্পীবৃন্দ। যারা বর্তমানে দেশের নানাস্থানে অনুষ্ঠান করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি ত্রিপুরার নানা দপ্তরের উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছেন — যেমন - (১) ত্রিপুরা ট্রাইবেল কালচারেল একাডেমী। (২) ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (৩) ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, (৪) আই.সি.এ.টি. ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি।

কলেজের ছাত্রীরা এন.এস.এস. ইউনিটের মাধ্যমে নানা সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাছাড়া ত্রিপুরার নানাস্থানে অংশগ্রহণ করে বেশ সুনাম অর্জন করে চলেছে।

❋ ❋ ❋

কবিতা

নামটি তাহার সংগীত মহাবিদ্যালয়

অঞ্জনা চক্রবর্তী

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা —
নাম পুলিন দেববর্মন,
প্রতি বছর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে
তাকে করি স্মরণ।
প্রতিষ্ঠাতার সমসাময়িক;
অশ্বিনীকুমার নাম।
তিনি ছিলেন বিশিষ্ট তবলাবাদক
ত্রিপুরা তার ধাম।।
অনেক জ্ঞানীগুণীর সমাবেশে
আর পাদস্পর্শে ধন্য এই স্থান
নাম বলব ক' জনের
শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করি তাদের অবদান।
পুরানো ঘর ছেড়ে এলাম নতুন ঘর
বর্তমানে এটি একটি দর্শনীয় স্থান,
আশা রাখি শিক্ষার্থীরা ছড়িয়ে দেবে
দিক্ -বিদিকে এই কলেজের নাম।।

আমি থাকি বই নিয়ে,
ওরা গায় গান
তে-রে-কে-টে - তাক, সা-রে-গা-মা
মিলে ধরে তান।
থেই থেই-তা - তা থেই
তালে করে নৃত্য
নাচ,গান,তবলায় ভরে ওঠে চিত্ত।।
সন্তানতুল্য ছাত্রছাত্রী
ওরা অতি শিষ্ট,
ওদের শান্ত নম্র ব্যবহার
মোদের কভু না করে রুষ্ট।

শান্তিনিকেতনের দিনগুলো

সুনেত্রা রায়

যতই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ততই অতীত পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে। যা মনের পাতায় টিঁকে থাকে তা ধীরে ধীরে অনেক অবান্তরের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আসলটা জ্বল জ্বল করতে থাকে। এক উৎসাহে উদ্দিপিত আলোর খেলা স্বপ্ন বয়ে কেবল এগিয়ে নিয়ে যায়। আমার শান্তিনিকেতনের মসৃণ পথ ধরে এগোনোর মূলে এমনি এক টগবগ উৎসাহ কাজ করে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন —

"আমার মধ্যে যদি প্রেম না জাগে, আনন্দ না থাকে, তবে বিশ্ব আমার পক্ষে কারাগার।" বলা ভালো, কারাগার থেকে সুন্দর জীবনের দিকে যেন এ আমার ডানা মেলা (বিস্তার)। সেদিন এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবো কিনা তা ভাবতে পারিনি। "Straight is the gate narrow is the way and few there be that find it." এ বোধ আমাকে সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে ধরে রাখতে পারেনি। তাই কেবল এগিয়ে চলা।

এপ্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া সমীচীন বলে মনে হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্মজীবনের শেষ পর্বে বানপ্রস্থের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করছিলেন। তাঁর চেষ্টার ফলশ্রুতিস্বরূপ নান্দনিক শান্তিনিকেতেনের প্রতিষ্ঠা। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যৎ কর্ণধার হিসাবে (রূপে) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শান্তিনিকেতনেই জীবন উৎসর্গ করে গেছেন বহুবিধ কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে। এই স্নিগ্ধ শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু লেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। কারণ শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতী বিশ্ববন্দিত সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান হয়ে আমাদের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। এ প্রসঙ্গে আমার ছোট্ট কথাটা এরকম দাঁড়ায়। ছোট বেলা থেকেই সঙ্গীত নিয়ে পড়তে

শুরু করলাম। আর ক্রমান্বয়ে শুনতে থাকলাম শান্তিনিকেতনের কথা, জ্ঞানী এবং গুণীজনদের কাছ থেকে। সেই থেকেই স্বপ্ন বুনতে শুরু করলাম শান্তিনিকেতনে সংগীত শিক্ষা নেবার। পরবর্তী পর্যায়ে সংগীত নিয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করার পর একরাশ বুকভরা আশা এবং স্বপ্ন নিয়ে পৌঁছলাম শান্তিনিকেতনের আনন্দ নিকেতনে। সেখানে কলেজের নিয়মানুযায়ী কঠিন ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে আমার সেই সুপ্ত স্বপ্ন সার্থক রূপ পায়। আমি সংগীত নিয়ে পড়াশুনার সুযোগ পাই শান্তিনিকেতনে। এভাবে শুরু হল আমার শান্তিনিকেতনের আশ্রম জীবন যাত্রা। আমি যে হোষ্টেলে সুযোগ পাই তার নাম হল 'আনন্দসদন হোষ্টেল।'

শান্তিনিকেতনের পড়াশুনা পদ্ধতি আমাদের এখানকার প্রথাগত পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। গুরু-শিষ্য পরম্পরা এবং একান্ত আশ্রম নির্ভর শিক্ষা প্রণালী এখানকার বৈশিষ্ট্য। সেই সুবাদে আমি প্রথমে / শিক্ষা শুরু করি আজকের দিনের বিশ্ববন্দিত মোহন সিং খাংগুরা মহাশয়ের কাছে। তিনি অবাঙ্গালি, পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় জন্ম। বিশাল এক শাস্ত্রীয় সংগীতের পরিবারে তাঁর জন্ম। শাস্ত্রীয় সংগীতে ছিল অগাধ পান্ডিত্য। রবীন্দ্র সংগীতেও তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। একালে রবীন্দ্রসংগীতের ওপর তাঁর অনেক ক্যাসেট বেরিয়েছে।

সংগীত বিভাগের ছাত্রী সুবাদে 'সংগীত ভবন' ছিল আমাদের সংগীত নিয়ে পড়ার মূল জায়গা। সেখানে গৌড়প্রাঙ্গন, আম্রকুঞ্জ ছিল। এই গৌড়প্রাঙ্গন এবং আম্রকুঞ্জের নীচে অনেক অনুষ্ঠান হত। আম্রকুঞ্জের গাছের নীচের ছোট বেদীতে বসে পাঠভবনের বালক বা বালিকাদের শিক্ষা দেওয়া হত। কত নির্মল আনন্দের মধ্য দিয়ে তাদের পড়াশুনা সম্পন্ন হত। বিশ্বভারতীতে চীনাভবন, পাঠভবন, বিদ্যাভবন, শিক্ষাভবন, প্রজ্ঞাভবন, সংগীতভবন, কলাভবন - এরকম প্রত্যেকটি বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকতো। একটা রীতি ছিল খুব সুন্দর। আমরা বিশ্বভারতীর সকল শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে দাদা এবং দিদি বলে সম্বোধন করতাম। এখানকার মত স্যার বা ম্যাডাম বলার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল না। এরমূলে যে অনুভব ছিল তা জড়িয়ে ছিল আন্তরিকতার নির্যাসে আনন্দবোধে। এ বোধটাকেই তো রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করে বলে গেছেন—

"আমার চেয়ে যে বড়ো তার কাছ আত্মসমর্পণ করার সুখই হচ্ছে আনন্দ।" (শান্তিনিকেতন)

দেশ বিদেশ থেকে অনেক পর্যটক বিশ্বভারতী পরিদর্শন করার জন্যে যেতেন। প্রথমেই তাঁরা যেতেন 'উত্তরায়নে'। এটা ঠিক, উত্তরায়নে কবিগুরুর যতটা স্মৃতি ধরে রাখা সম্ভব, ততটা স্মৃতিই সংরক্ষিত রাখা আছে। কাজেই এর প্রতি দর্শক এবং পর্যটকদের প্রাণের নিবিড় টান ছিল। সে জায়গাটায় কবিগুরুর নিজস্ব পাঁচখানা ঘর ছিল। সকল বইপত্র, হাতের আংটি, লাঠি, জামা, তাঁর নিজস্ব গাড়ী, পায়ের খড়ম, চেয়ার টেবিল, বিছানা ইত্যাদি রয়েছে। সেই সময়কালকে ধরে রাখবার এর চেয়ে বড় আর কী থাকতে পারে।

শান্তিনিকেতন থেকে যখন আমরা উত্তরায়নে প্রবেশ করতাম তখন আমাদের মনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে যেত। তারপর দর্শনীয় বস্তু হল উপাসনা মন্দির। প্রতি বুধবারে আমাদের কলেজ বন্ধ থাকতো। অবশ্য প্রতি বুধবার সন্ধ্যাবেলায় আমাদের উপাসনা মন্দিরে যাবার নিয়ম ছিল। রেওয়াজ মতো অনেক অনুষ্ঠান হত এই উপাসনা মন্দিরে। তাছাড়া ঐ মন্দিরে, বৈদিক মন্ত্র, স্তোত্র পাঠ, বৈদিক শ্লোক ইত্যাদি পাঠ করা হত। অতঃপর শুরু হত রবীন্দ্র সংগীত। ঐ মন্দিরকে

কাঁচঘরও বলা হত কারণ পুরো মন্দিরটাই ছিল কাঁচের তৈরী। অধিকন্তু, মন্দিরের দৃশ্যরাজি ছিল অপরূপ দৃষ্টিনন্দন। তারপর শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত নদী হল কোপাই নদী। এই নদীর দৃশ্য মনোরম। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার পটভূমিকায় এই নদীর উল্লেখ রয়েছে। চারদিকের লাল মাটিতে ঘেরা এই নদী। লাল মাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় কথাশিল্পী/ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের কথা। তারপর রয়েছে — সোনাঝুড়ি, ভুবনডাংগা। ভুবনডাংগাতে পাওয়া যায় লেদারের ব্যাগ (চামড়ার), বাটিকের ও বাঁধনির তৈরী ব্যাগ, চুড়িদার পীস, ব্লাউজ পীস, তারপর ডোকরার গয়না ইত্যাদিও পাওয়া যায়। উল্লেখ করা যায়, ডোখরার গয়না শান্তিনিকেতনে খুব বিখ্যাত গয়না। আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডোকরার গয়না পরতাম। ডোকরার গলার মালা, হাতের বালা, খোপার কাটা এগুলো ব্যবহার করতাম। (ব্যবহার করে আনন্দ পেতাম)। প্রধানত সাঁওতালীরা এই ডোকরার গয়না ব্যবহার করতো। এ যেন ঐহিত্য চেতনারই ফসল। দিবে আর নিবে Give & Take - এর মহা সমন্বয় ক্ষেত্র বলতে গেলে এই শান্তিনিকেতন। একটা চিরায়ত প্রথার ওপর গায়ে রঙ লাগিয়ে একে জীবনের উপযোগী করে তোলা কম কথা নয়।

উৎসব আমাদের প্রাণে। এই উৎসবের আগমনী এবং বোধন মনের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে গেছেন ঃ উৎসবের পরদিন আমাদের কাছে বড়ো ম্লান। সেদিন আমাদের আলোর উজ্জ্বলতা চলে যায়, সেদিন অবসাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। (শান্তিনিকেতন)

শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত উৎসবের মধ্যে বিখ্যাত সুপ্রচলিত হল ঃ বসন্ত উৎসব, পৌষমেলা, শারদোৎসব, বর্ষামঙ্গল। তাছাড়া আরও মনমাতানো উৎসব রয়েছে। বলা ভালো রবীন্দ্র জন্মোৎসব, নববর্ষ উৎসব, বৃক্ষরোপন উৎসব, বর্ষামঙ্গল, শিল্পোৎসব, স্বাধীনতা দিবস ও সাধারণতন্ত্র দিবস, নন্দনমেলা, মহর্ষি স্মরণ — এই সকল উৎসব শান্তিনিকেতনের আনন্দবহরকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

বসন্ত উৎসবের সময় পলাশ ফুলের রঙবাহার শান্তিনিকেতনকে ভরে তোলে। বসন্ত উৎসবের প্রায় একমাস আগে থেকেই অনুষ্ঠানের মহড়া আরম্ভ হয়ে যেত। চারদিকে নৃত্য, গানবাজনার সমাগমে শান্তিনিকেতন যেন মধুময় হয়ে উঠতো। দেশ বিদেশের অনেক মানুষ আগেভাগেই বসন্ত উৎসব দেখবার জন্যে মিলিত হতেন। মিলনমেলার এ দৃশ্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

বসন্ত উৎসবে ভোরবেলা আমরা লাল ব্লাউজ লাল পাড় হলুদ শাড়ি পরে নিজের হাতে তৈরী পলাশ ফুলের গয়না পরে আমরা ''ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল'' এই গানটির সঙ্গে - লাঠি নৃত্য করতাম। তারপর গৌড় প্রাঙ্গনের মঞ্চে শুরু হত নাচ গানের অনুষ্ঠান। দীর্ঘ সময় ধরে চলতো সেই প্রাণমাতানো অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে শেষ সঙ্গীতটি পরিবেশিত হত 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও, যাও যাও গো এবার যাবার আগে।' এই গানটি চলাকালীন সময় থেকেই শুরু হয়ে যেত আবির খেলা। সকল ছাত্রছাত্রী মিলে সারাদিন ব্যাপি শুধু আবির খেলতাম। প্রাণময় সে আনন্দের সীমানা আমরা খুঁজে পেতাম না। সন্ধ্যার পর গৌড়প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হত রবীন্দ্র গীতিনাট্য। কোন বছর চন্ডালিকা, কোন বছর চিত্রাঙ্গদা, কোন বছর ভানুসিংহের পদাবলী।

তারপর ডিসেম্বর মাস আসতেই আমরা ৭ই পৌষ অর্থাৎ পৌষমেলা নিয়ে মেতে উঠতাম।

এই ৭ই পৌষ গৌড়প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হত বিরাট বড় অনুষ্ঠান। আমার সময়কালে দেখেছি শান্তিদেব ঘোষ এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করতেন। অনুষ্ঠান পরে আমরা সবাই মিলে মেলা প্রাঙ্গনে চলে যেতাম। কতো বিখ্যাত এই পৌষ মেলা। দেশ, বিদেশের অগণিত মানুষের সমাগমে শান্ত এবং নীরব শান্তিনিকেতন মেলা বিরাট কোলাহলের জন্ম দিত। মজার ব্যাপার সকল হোটেল, গেষ্ট হাউজ, লজ দু-মাস আগে থেকেই বুকিং হয়ে যেত। মেলা উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হত। মনে হয় এখনও এনিয়ম চালু রয়েছে। ৭ থেকে ৯ই পৌষ - এই তিনদিন অরধি মেলা চলতো। এই তিনদিন পর থেকেই শুরু হয়ে যেত ভাংগামেলা। এই ভাংগামেলা চলতো প্রায় পাঁচ-ছ দিন ধরে। দেশ বিদেশের অনেক ধরণের জিনিস এই মেলায় পাওয়া যেত। কতো জিনিস আমরা মেলা থেকে কিন্‌তাম তার সীমা পরিসীমা ছিল না। ক্লাস সেরে একটু সময় পেলেই আমরা সকল বান্ধবীরা মিলে মেলায় বেরিয়ে পড়তাম।

শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন বিভিন্ন গুণীজনদের শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে খুব কাছে পেয়েছিলাম। তাঁদের অভিজ্ঞতা, জীবনবোধ এবং শিক্ষাদান প্রণালী চমৎকার ভাবে অনুপ্রানিত করেছে। এঁদের স্নেহপ্রবণ সান্নিধ্য পাবো তা জীবনে ভাবতেও পারিনি। এ প্রসঙ্গে আমাদের সময়কার শিক্ষক শিক্ষিকাদের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁরা হলেন, 'মোহনসিং খাংগুড়া', 'সুনির্মল বসু', মাধবীদি, ইন্দ্রানীদি, গোরা সর্বাধিকারী, মোহরদি (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়), মলয় দাশগুপ্ত এবং স্বস্তিকা মুখ্যোপাধ্যায়। কবিগুরু কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটবেলার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মোহর নামে অভিহিত করেন। গানটি ছিল 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে'। আমরা মাঝে মাঝে গান শুনবার জন্যে তাঁর বাড়িতে যেতাম। বিষ্ময় লাগে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কাল মানে সমস্ত জীবনটাই তাঁর শান্তিনিকেতনে কেটেছে। একথা ঠিক, শান্তিনিকেতনে বসবাসকালে আমরা অনেক গুণীজনের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছি। আজ ভাবি, এর মূল্য তো মোটেই কম নয়। যেমন - পন্ডিত রবিশঙ্কর, পন্ডিত যশরাজ, গিরিজাদেবী। মোটকথা, ভারতবর্ষের অত্যন্ত বিখ্যাত গায়ক, বাদক এবং নৃত্য শিল্পীরা শান্তিনিকেতনে এসে অনুষ্ঠান করতে পেরে নিজেদের ধন্য বলে মনে করতেন। মনে পড়ছে - লতা মুঙ্গেশকর 'দেশীকোত্তম' খেতাব এবং পুরস্কার নেবার জন্যে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। এ সকল মুহুর্তগুলো আজও প্রেরণা সঞ্চার করে।

সেখানে বছর বছর দৃষ্টিনন্দন সমাবর্তন উৎসব (Convocation) অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের চ্যান্‌সেলর ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসেন এবং বি.মিউজ ফাইন্যাল ও এম.মিউজ ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিদ্যার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ভাবগম্ভীর এ অনুষ্ঠান সুন্দর হয়। আমাদের সময় বি.মিউজ পরীক্ষার সার্টিফিকেট মাননীয় 'আই.কে. গুজরাল' মহাশয় বিতরণ করেন। বিশ্বভারতীর কাজকর্মের সমূহ দায়িত্ব চ্যান্‌সেলর অর্থাৎ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিশ্বভারতীর একজন প্রাক্তন ছাত্রী হবার সুবাদে অনেক দুর্লভ

অনুষ্ঠানের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অবগত হবার সুযোগ পেয়েছি জীবনে। সেই সব টুকরো টুকরো স্মৃতি আজও আমাকে অনুপ্রাণিত করে। সেই সকল অনবদ্য অনুষ্ঠান এবং ঘটনাবলীর আকর্ষণ আমাকে দু-চার কথা লিখতে ভীষণভাবে প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের জহর থেকে যেসকল মনিমুক্তা কুড়াতে পেরেছি তা সম্ভব হত না, যদি না সেই জীবন ধারার সঙ্গে মিশে থাকতে পারতাম। আর এরকম একটা লেখার দুঃসাহসই বা হত কী করে? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অমূল্য চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটিয়ে গেছেন তা আজও আপামর বিশ্ববাসীর কাছে সাদরে অস্মরণীয় এবং সমাদৃত। পরিশেষে বলা যায়, তিনিই "আমার আত্মার শান্তি তিনিই" "আমার প্রাণের আরাম।" অর্থাৎ ঈশ্বরই আনন্দ, শান্তি ও বিশ্রামের উৎস। শান্তিনিকেতনের মূলমন্ত্রে - বিধৃত আছে পূজার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা চলবে না। আশ্রমের সীমার মধ্যে কোন প্রান নষ্ট করা চলবে না। ধর্ম সম্বন্ধে কোন বিতর্ক চলবে না। এই মৌল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আজও বিশ্বভারতী বিশ্বের দরবারে সর্বজন বন্দিত স্থান।

❄ ❄ ❄

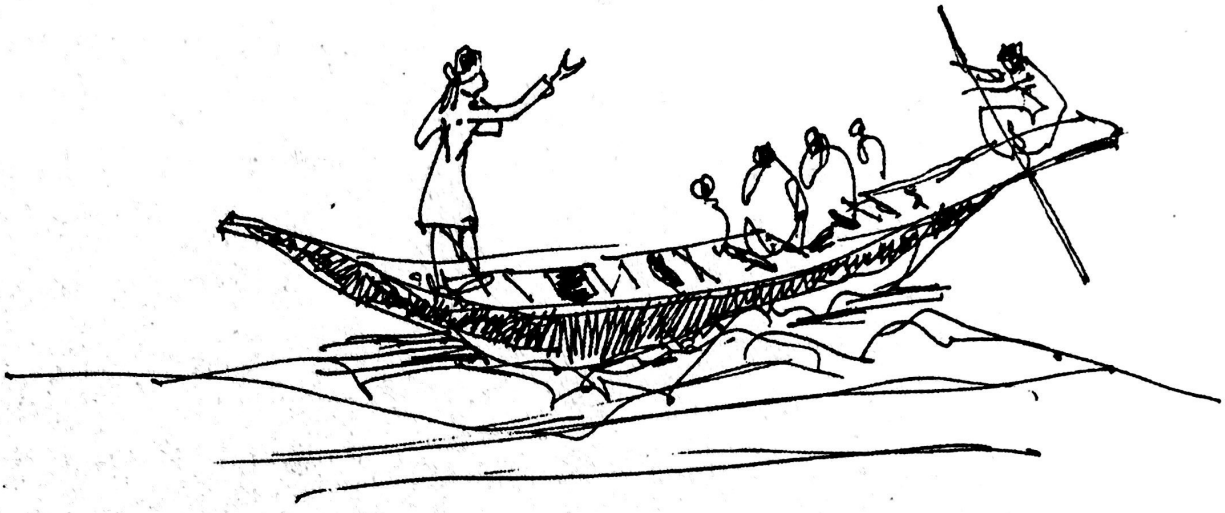

ভাটিয়ালি-বাংলার প্রাণের গান

মণিকা দাস, সহ-অধ্যাপিকা

ভাটিয়ালি শব্দটি মনে হতেই চোখের সামনে ভেসে উঠে বর্ষার ভরা নদী, নৌকো ও মাঝির চিত্র। অলস মন্থর গতিতে নৌকো ভাটির দিকে চালিয়ে দিয়ে মাঝির আপনমনে দরাজ গলায় গান গেয়ে যাওয়ার ছবি চোখে ভাসতেই মনটা উদাস হয়, তারসঙ্গে রোমান্টিক একটা অনুভূতি যেমন হয় তেমনি নানা ধরনের রূপকথার গল্পও মনের ক্যানভাসে উঁকিঝুকি দিতে থাকে। ভাটিয়ালির সুর প্রকৃতির একেবারে কাছের মাটি-ঘেষা, জল-ঘেষা সুর। এই সুর এমন যা একবার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিলে অবশ্যই তা প্রাণকে আকুল না করে ছাড়েনা। সুরের আবেশে মন উদাসী হয় এবং হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তার অনুরণন চলতে থাকে।

নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গই ভাটিয়ালি গানের প্রসুতি, এখানেই ভাটিয়ালি জন্মলাভ করে এবং বিকাশপ্রাপ্ত হয়। সেখানকার দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমি বা হাওরের বুকের উপর দিয়ে মন্দগতিতে ভাসমান নৌকোর হাল ধরে মাঝি যখন একটু বিশ্রাম পায় তখন প্রকৃতিগত প্রেরণাতেই তার কণ্ঠে জেগে উঠে ভাটিয়ালির সুর। শুধু জলাভূমি নয়, বাংলার দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর দিয়ে পদব্রজে যাওয়ার সময় পথিকের মনেও যেরকম উদাসীনতা, বিষন্নতা ও বৈরাগ্য আসে তাও ভাটিয়ালির প্রেরণা যোগায়। ভাটিয়ালি ব্যক্তিকেন্দ্রিক একক কণ্ঠের সুর প্রধান গান। বিষয়বস্তু মুখ্যত লৌকিক ও আধ্যাত্মিক প্রেম এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলা। প্রেমের গানে বিরহ-বিচ্ছেদের এবং আধ্যাত্মিক গানে অনিত্য সংসারের হতাশা ও নৈরাশ্যের করুণ সুর ফুটে উঠে। ভাটিয়ালিকে কেউ 'ভাটি অঞ্চলের সংগীত' বলেছেন, কেউ বলেছেন 'নদী ও জীবনস্রোতের অপূর্ব সমন্বয়' আবার কেউ কেউ একে 'নদীস্রোতের সমন্বয়তার সঙ্গে জীবন সায়াহ্নের অবসন্ন বিষন্নতার বিষাদবীণা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন।

জসীমউদ্দীন পূর্ববাংলার নৌকোর মাঝিদেরকেই ভাটিয়ালি গানের মূল স্রষ্টা বলেছেন। বাড়ি ঘর ছেড়ে মাঝিরা দিনের পর দিন কাটাত নদীর বুকে - সেই সময়গুলিতে তাদের একাকীত্ব ও নির্জনতার যন্ত্রনা, প্রেম এবং প্রিয়জনদের প্রতি বিরহকাতরতা বাণীরূপে সুরের বাহনে ভর

শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের নতুন ভবন

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার

স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন

পুলিন দেববর্মা স্মৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ এবং অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলন

মহাবিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

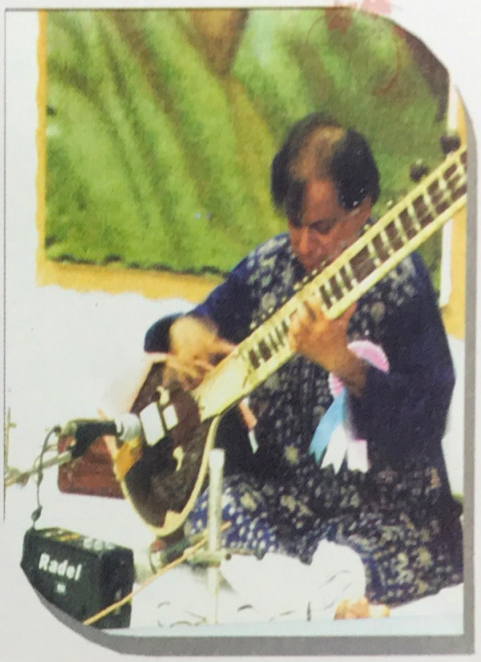

মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহন

করে ভাটিয়ালি সঙ্গীতের অবয়ব তৈরি করেছে। এ গান মূলত মাঝিমাল্লার গান হলেও এর সুরের চৌম্বকীয় আবেশে মুগ্ধ বাংলার রাখাল বাউল বৈরাগী এবং লোকসাধারণেরাও।

সকল প্রকার লোকসঙ্গীতেরই সৃজন পালন ও পুষ্টি ঘটে স্বতস্ফূর্তভাবে সেই সেই অঞ্চলের প্রকৃতি পরিবেশ ও সমাজমানসিকতার পটভূমিতে। ভৌগোলিক পরিবেশ ও সেখানকার মানুষের জীবন জীবিকার স্বাতন্ত্রের জন্যই লোকসঙ্গীত সমূহ অঞ্চলভেদে বিশিষ্টতা লাভ করে থাকে। তাই লোকসঙ্গীত গবেষকেরা অঞ্চলগুলোর ভৌগোলিক বিভাজনের উপর গুরুত্ব দিয়েই - ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা, বারাসে, বাউল, মুর্শিদি, মারফতি ইত্যাদি নামের এক একটি অঞ্চল চিহ্নিত করেছেন। সেই হিসেবে ভাটিয়ালির অঞ্চল হল - ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, নেত্রকোনা, সিলেট ও হবিগঞ্জ জেলাসমূহ। কেউ কেউ আবার নদী খাল বিল অধ্যুষিত - পাবনা, রাজসাহী, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর ও চট্টগ্রামকে এর অন্তর্ভুক্ত করেন। কারণ সে অঞ্চলগুলিতেও ভাটিয়ালির যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। বিখ্যাত লোকসঙ্গীত গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ভাটিয়ালির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে চর্যাপদে চলে গেছেন। চর্যাপদের অন্যতম পদকর্তা ভুসুকুপাদের রচিত 'বঙ্গাল' রাগের থেকে ভাটিয়ালি রাগ সৃষ্ট বলে তিনি অনুমান করেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত 'ভাটিয়ালি' নামটি পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে 'ভাটিয়ারী' নামে একটি রাগিনীর উল্লেখ আছে যার ব্যাপক প্রচলন মধ্যযুগীয় বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতদিগের মতে বাংলার লোকসঙ্গীত ভাটিয়ালির সঙ্গে প্রকৃতিগত ও বৈশিষ্ট্যগতভাবে রাগসঙ্গীত 'ভাটিয়ারী'র কোন মিল নেই। বড়ুচন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সর্বপ্রথম 'ভাটিয়ালি' রাগেন সন্ধান পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় পূর্ববঙ্গের মাঝিমাল্লাদের কাছ থেকেই এই জনপ্রিয় সঙ্গীত পশ্চিম ও রাঢ় অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এরপর সপ্তদশ শতাব্দীর কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম এলাকার কবিদের কাব্যে 'ভাটিয়ালি' নামক রাগের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া' নামক সংস্কৃতগ্রন্থে 'ভাটিয়ালী রাগের গীয়তে' বলে একটি ছড়াধর্মী সঙ্গীতের উল্লেখ আছে, যা নদীর ঘাট থেকে স্নান সেরে ফেরার পথে দুই ডাইনী গেয়েছিল। এছাড়া দোনাগাজীর 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমান' দ্বিজরামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' এবং আলাওয়ের 'পদ্মাবতী'তে এই ভাটিয়ালি রাগের উল্লেখ আছে।

রচনার দিক থেকে ভাটিয়ালি নিতান্ত সরল ও সংক্ষিপ্ত কারণ এই জাতীয় গানে কথার তুলনায় স্বরই প্রাধান্য লাভ করে। বেশীরভাগ গান অন্তরাতেই শেষ হয়ে যায়। তবে কিছু কিছু গানে সঞ্চারী, আভোগও রয়েছে। প্রেম, বিরহ, রাধাকৃষ্ণলীলা ও আধ্যাত্মচিন্তার এইগানগুলি গায়কের অন্তরের মাধুর্যমন্ডিত হয়ে উদাত্ত স্বর সহযোগে কণ্ঠ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়। এই গানের আরেকটি প্রয়োগক্ষেত্র হল রূপকথা। রূপকথার কাহিনী বর্ণনা করতে করতে যেখানে বর্ণনা অতিশয় করুণ বা গীতিধর্মী হয় সে সব স্থানে বিরহ ও বিচ্ছেদমূলক অংশ ভাটিয়ালির সুরে পরিবেশিত হয়। ভাটিয়ালি মাঝিমাল্লার ও রাখাল-মহিষালের গান হলেও অন্তপুরের ছোট থেকে বড় সকলের বিশেষ করে বর্ষীয়সী মহলের অতিশয় জনপ্রিয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভাব, ভাষা, সুর, ছন্দ ইত্যাদি মিলিয়ে ভাটিয়ালি গানের একটি নিজস্ব জগৎ ও স্বতন্ত্র চরিত্র আছে। সহজ সরল জীবনবোধ সম্পন্ন রচনাগুলির স্বচ্ছন্দতা ও স্বতস্ফূর্ততার তুলনা নেই। ডঃ ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন - 'সাধারণ মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতা কত উচ্চ ও উন্নত হতে পারে, গানগুলোতে তার ও প্রমাণ আছে। নদী নৌকা ও মাঝিকেন্দ্রিক এসব গানে পাঠক নদীমাতৃক বাংলাদেশের হৃদয় কলরব শুনতে পারেন।' নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি আধ্যত্মিকতার স্পর্শরহিত হয়েও এখানে লৌকিক প্রেম-ব্যর্থতার হাহাকার অনুভূতির আন্তরিকতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'বন্ধু, কই রইলারে
অকূলে ভাসাইয়া, বন্ধু, কই রইলারে।
লহর দরিয়ার বুকে মইলাম সীতারিয়া,
কী দুঃখ বুঝিবে বন্ধু, কিনারায় দাড়াইয়া।
'বন্ধু, কই রইলারে!
বন্ধুরে, কুল নাই, কিনারা নাই
উঠছে কত ঢেউ
এমন নিদান কালে
সঙ্গী নাই মোর কেউ
বন্ধু, কই রইলারে।'

বাংলাদেশে 'কানু বিনে গীত নাই' অর্থাৎ প্রেমের গানে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ আসবেনা এ ধারণা লোকজীবনে কল্পনার অতীত-এ কারণেই হোক আর বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবেই হোক ধীরে ধীরে রাধাকৃষ্ণলীলা ভাটিয়ালির বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে —

এই না কালরূপ আমার লাগল নয়নে গো।
কলঙ্ক রইল জলে।
ভরা দুইফরের কালে জল ভরিবার যাই।
জলের ছায়ায় কৃষ্ণ রূপ গো, যেমন দেখিবারে পাই গো।
কলঙ্ক রইল জলে।
সব সখী লাল গো, নীল গৌর বরণ শাড়ি।
শ্রীরাধা পৈরণে শোভে গো, কৃষ্ণ নীলাম্বরী গো।
কলঙ্ক রইল জলে।। (ঢাকা)

ধীরে ধীরে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা লৌকিক প্রেমের পর্যায় থেকে অতীন্দ্রিয় প্রেমের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে -

ওগো রাধে, গোকুলেতে থাকি
তোমার লাগি পরের মাকে
আমি মা বলিয়া ডাকি গো।

কুল দিলাম মান দিলাম
আর কি আছে বাকী।
তোমার লাগি ব্রজপুরে আমি মুরলী শিখি গো,
গোকুলে নন্দের ঘরে ধেনু বৎস রাখি।
তোমার শ্রীচরণের লাগি
আমি দাসখত লিখি।

শুধু রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ নয়, লোকজীবনের গান ভাটিয়ালিতে সমাজের অন্যান্য দিক ও উঠে এসেছে। নদীর ঘাটে অবগাহনরত সুন্দরী রমনীকে দেখে মাঝির প্রেমিক মন প্রেমসাগরে ডুব দেয়, হাল ধরতে চায়না, তাই সে গেয়ে উঠে -

আরে ও কলসী কাঁখের নারী,
সোনার যয়বন হাইল্যা পড়ে বদন-ভিজা শাড়ি।।
একা কেনে আইলেরে ঘাটে নবীন কিশোরী।
যদি কোন সদাগরে তোমায় করে চুরি।।
কেমন তোমার মাতাপিতা কেমন তোমার হিয়া।
তোমারে পাঠাইছে ঘাটে কলসী কাঁখে দিয়া।।
দুপুরবেলা একলা ঘাটে রূপের পসারী।
প্রেমসাগরে ঢেউ তুলিলে, কেমনে হাইল ধরি।।
যাও ফিরিয়া রূপের কন্যা যাও ফিরিয়া ঘরে।
এই দেশে নাই প্রেমের মানুষ তোমায় যতন করে।।

আবার কখনও কখনও মাঝির কণ্ঠের এই উদাত্ত আহ্বানে নদীর ঘাটে জল নিতে আসা যুবতী হৃদয়। বিমোহিত হয় তার মনেও প্রেমের রঙ লাগে, স্রোতের টানে কলসী ভেসে গেলে কলসী ধেরে দেওয়ার বাহানায় সে মাঝিকে আহ্বান জানায় তাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় -

আরে ও, ওরে সুজন নাইয়া,
কোন বা দেশে যাওরে তুমি সোনার তরী বাইয়া।।
কোন্ বা দেশে বাড়ি তোমার, কোন বা দেশে যাও।
এই ঘাটে লাগাইয়া নাও, আমায় লইয়া যাও।
সোনার তরী রঙের বাদাম দিয়াছ উড়াইয়া।
পূবালী বাসাতে বাদাম উড়ে রইয়া রইয়া।
রঙ দেখিয়া এই অভাগী কান্দে ঘাটে বইয়া।
স্রোতের টানে কলসী আমার গেলেরে ভাসিয়া।
আইস, আইস, সুজন নাইয়া কলসী দেও ধরিয়া।
কি ধন লইয়া যাইব ঘরে শূন্য আমার হিয়া।

আবার কোনও বিরহিনী চাতকের মতো দয়িতের অপেক্ষা করতে করতে নিরুপায় হয়ে লজ্জা সরম ভুলে ভিন্‌দেশী মাঝিকে শুধায়, দুঃখের কথা বলে এবং দয়িত সম্পর্কে জানতে চায়,

মাঝিকে অনুরোধ জানায় যে মাঝি যেন তার দয়িতের দেখা পেলে তাকে বলে যে মৃত্যুর পূর্বে অন্তত যেন একবারটি এসে তাকে দেখে যায়। বিরহের এই গানটি খুবই হৃদয়গ্রাহী -

আরে ও ভিন গেরামের নাইয়া।
তুমি কোন বা কন্যার দেশে যাওরে প্রেমের তরী বাইয়া।।
গাঙের ঘাটে বইসারে কান্দি কলসী যায় ভাসিয়া।
কোন্ বা দেশে রইলারে নিঠুর না দেখল আসিয়া।।
নয়ন গেল চাইয়া রে চাইয়া যয়বন গেল বইয়া।
কোন্ পরানে হইলরে নিঠুর আমারে পাশুরিয়া।।
দেখা পাইলে কইওরে মরণকালে আইয়া।
দুই নয়নে যায় দেখিয়া আমায় কোলে লইয়া।।

কোন কোন কুলরমনী শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনের কথা উজান দেশের মাঝি ভাইকে জানায়, যাতে ঐ মাঝি তার বাপের বাড়ির দেশে খবর পৌঁছে দেয়। তাই সে বলে —

উজান দেশের মাঝি ভাইধন
ভাটির দেশে যাও
বাজানেরে কইও খবর
দেখা যদি পাও।।
নন্দের চোখে বিষ হইয়াছি
শাশুড়ীর চোখে শাল,
ডাইনের কপাল বায়ে গেছে
আমার দুক্কের কাল,
আমার কান্দে কান্দে জনম গেল
পন্থের পানে চাইয়া।
এবার যদি না নেয় নাইওর
নায়ে ছইয়া দিয়া
কয়দিন বাদে আবার কইও
বাঁশের পালঙ লইয়া,
আমি নাইওর যাবার সাধ মিটাব
বিশষের বড় খাইয়া।। (ঢাকা অঞ্চল)

এইভাবে শ্বশুরবাড়ির লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও নিপীড়নের সকরুণ কাহিনী স্থান পেয়েছে ভাটিয়ালি সঙ্গীতের ধারায়। এ থেকে সমাজে বধূ জীবনের মর্মান্তিক দিকটির পরিচয় পাওয়া যায়। লোকজীবনের প্রেম, বিরহ, বিচ্ছেদ - এ সব কিছুই লোক-কবিদের রচনায় স্থান পেয়েছে, এসব ছাড়াও ভাটিয়ালিতে ক্রমে ক্রমে আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্ব বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। আধ্যাত্মজীবনের অসম্পূর্ণতার আকুলতায় নিম্নলিখিত পদটি রচিত হয়েছে -

'জীবনের নাইরে আশা, কর শ্রীগুরুর চরণ ভরসা।

দেহের গুমান কর মিছে, নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আছে?
কাল শমনে জাল পেতেছে -
ভাঙবে রে তোর সুখের বাসা।
ভাই বন্ধু দায়া সুত সকল পথের পরিচিত,
যখন প্রাণ তোর হবে হত কেউ না করবে জিজ্ঞাসা।
আপন আপন বল যারে কেউ তো সঙ্গে যাবে নারে,
গুরুভজন হইলনারে,কেবল ভবে যাওয়া আসা।'

লোককবিরা শুধু প্রেমিক নন, তাঁরা ভাবুক এবং দার্শনিক ও বটে, তাঁদের অনুভূতি প্রকাশের ভাষা সহজ সরল ও অনন্য। তাই তাঁদের রচনায় জীবনরসের শাশ্বত দিকে উদ্ভাস ঘটিয়ে তাঁরা গাইতে পারেন -

'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আমি জনম ভইরা বাইলাম বৈঠা রে-
তরী ভাইট্যায় বয় আর উজায় না।
ওরে জঙ্গি রসি যতই কসি,
ওরে হাইলেতে জল মানেনা।
নায়ের তলী খসা, গোড়া ভাঙা রে -
নায়ত গাব গয়নি মানেনা।'

এর মধ্যে যেমন আছে ভাবের গভীরতা, তেমনি রয়েছে লোকায়ত দর্শনের প্রভাব। এইভাবে ধীরে ধীরে ভাটিয়ালিতে প্রেম বিরহ বিচ্ছেদ ইত্যাদির সঙ্গে ভক্তিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় এসে মিশেছে।

ভাটিয়ালির সুররীতি সমতল বাংলা প্রধান সুররীতি। এর মসৃণ প্রবাহমান সুর বানীর আবেদনকে তীব্রতর করতে সাহায্য করে। লোকসঙ্গীতবিদ সঙ্গীতাচার্য সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী পূর্ববাংলার ভাটিয়ালিকে 'খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত ঝিঁঝিট রাগিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।' সুরের দিক থেকে ভাটিয়ালির অসামান্য প্রভাব রয়েছে বাংলার অন্যান্য লোকসঙ্গীতের উপর। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সারি গানের সঙ্গে ভাটিয়ালির নিকট সাদৃশ্য রয়েছে - সারিগান যেমন নদী নৌকা ও মাঝিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে ভাটিয়ালিও তাই। দুটিরই মূল বিষয় হল - লৌকিক প্রেম, রাধাকৃষ্ণ লীলা এবং আধ্যাত্মিকতা। তবে বিশেষজ্ঞরা দলীয় সঙ্গীত সারি গানকে ভাটিয়ালির থেকে পূর্বতন বলে ধারণা করছেন। ভাটিয়ালি অবসর সময়ের একক কণ্ঠের গান, এর সুর বিলম্বিত, সুরে দীর্ঘ টান আছে, নির্দিষ্ট তাল নেই, লয় ধীর ও প্রলম্বিত, সুরে কারুণ্য বিদ্যমান এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার একেবারে নেই বললেই চলে। অপরপক্ষে সারি বহুকণ্ঠীয় কর্মসঙ্গীত - এর সুর খর্ব, লয় দ্রুত এবং নির্দিষ্ট তাল আছে। এটি সারিন্দা ঢোল ও খনজনী নিয়ে গাওয়া হয়। এই ধরনের বাহ্যিক পার্থক্য ছাড়াও সারি ও ভাটিয়ালির মধ্যে বেশ কিছু আভ্যন্তরীণ পার্থক্যও রয়েছে, যেমন উভয় ধরনের গানই নদী নৌকো ও মাঝিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও ভাবের

দিক থেকে, রসের দিক থেকে এবং বোধের দিক থেকে একেবারেই ভিন্নধর্মী। ডঃ ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন- 'সারি ও ভাটিয়ালি এক ভুবনের গান হয়েও দুই মেরুতে অবস্থান করে। একটিতে জীবনের আশা আকাঙ্খা ও প্রাণচাঞ্চল্য অপরটিতে হতাশা ও বৈরাগ্য। ভাটিয়ালি গানের ভাব সম্পূর্ণ অশ্লীলতা মুক্ত। সারি গানে রঙ্গ ব্যঙ্গ ও রসিকতার সঙ্গে রুচিহীনতার স্থান থাকলেও ভাটিয়ালির কোন স্তরেই তা লক্ষিত হয়না অর্থাৎ কদাপি এটি মার্জিত রুচিবোধের সীমানা ছাড়িয়ে যায়নি। যে কোন লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি বিরল। ডঃ ওয়াকিল আহমেদের মতে - 'পবিত্র বিরহ ভাবনা ও চিরন্তন কান্নার সুর ভাটিয়ালি গানকে সকল প্রকার পঙ্কিলতা ও অধঃপতন থেকে রক্ষা করেছে।'

সারি গানের সঙ্গে ভাটিয়ালির সুরের বিস্তর পার্থক্য থাকলেও এর সুরের অসামান্য প্রভাব রয়েছে বাংলার অন্যান্য লোকসঙ্গীতের উপর। বিশেষত বাউল, মুর্শিদি, মারফতি, কীর্তন ও দেহতত্ত্ব প্রভৃতি গানের সুরের প্রধান ভিত্তি হল ভাটিয়ালি। তবে এসব গানের তত্ত্বনির্ভর কাব্যসৌন্দর্যের তুলনায় ভাটিয়ালি অনেক সহজ সরল ও নিরাভরণ।

বাউল গানের সঙ্গে ভাটিয়ালির একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে - অ সলে বহু সংখ্যক বাউল গানের সুরের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে ভাটিয়ালির সুরের উপর। আসলে বাউল হল এক বিশেষ সাধনপ্রনালীর নাম, এই বাউল সম্প্রদায় বাংলার কোন বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়, তারা যে অঞ্চলে বাস করে সেই অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের সুরের উপর ভিত্তি করে তাদের গান সমূহ রচনা করে থাকে, তাই বাউল সুর বলে আলাদা কোন সুর নেই বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এ জন্যেই দেখা যায় পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বেশীরভাগ বাউল গান ভাটিয়ালি ও সারি গানের সুর রচিত এবং পশ্চিমবঙ্গের বেশীরভাগ বাউল গান রচিত হয়েছে ঝুমুর ও কীর্ত্তনের সুরে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন - 'ভাটিয়ালির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার মধ্য দিয়ে জীবনের সুগভীর তত্ত্বকথা অতি সহজে প্রকাশ পাইতে পারে, সেই সূত্রেই বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শিদ্যা, মারফতি ও নানা বৈরাগ্যমূলক সঙ্গীত ভাটিয়ালিকে আশ্রয় করিয়াই রূপ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে নৃত্য অপরিহার্য, সেখানে সারি শ্রেণীর গান ব্যতীত ভাটিয়ালি ব্যবহৃত হইতে পারেনা। (লোকসংস্কৃতি গবেষণা ঃ মাঘ, চৈত্র, ১৪০১, ভাটিয়ালি বিশেষ সংখ্যা)

আবার আধ্যাত্মিক ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক ভাটিয়ালি গানের সঙ্গে মুর্শিদা গানের পার্থক্য করা কঠিন ব্যাপার। কারণ - হিন্দুর যেমন গুরু মুসলমানের তেমন মুর্শিদ। গুরুরূপ মুর্শিদের চরণ শরণ করে ভক্ত হৃদয়ের যে আর্তি ও কান্না তাই হল মুর্শিদা গানের বিষয়। এই ধরনের আর্তি ও কান্না আধ্যাত্মিক ভাটিয়ালিতেও বর্তমান। তাই ডঃ ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন - 'ভাটিয়ালির সুর নিয়েই মুর্শিদা গানের সৃষ্টি, অপরদিকে মুর্শিদা গানে তত্ত্ব নিয়ে ভাটিয়ালি গানের সৃষ্টি' শুধুমাত্র ভাটিয়ালি গানর দেশী সুরের সঙ্গে সুফীদের ইরানী গজলের আমেজ মুর্শিদাকে ভাটিয়ালি থেকে পৃথক করেছে।

ভাটিয়ালি বিশেষ অর্থে একক সঙ্গীত কারণ গান গাওয়ার সময় গায়কের যেমন কোনও সঙ্গী থাকেনা তেমনি গায়কের সামনে কোন শ্রোতাও থাকেনা, ফলে গায়ককে শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য গাইতে হয়না বা বিশেষ কোন চিন্তা করতে হয়না। একান্তে আত্মমগ্ন অবস্থায় গায়ক গান

করে যায় ফলে তার অন্তরের সহজাত মৌলিক অনুভূতিগুলির বহিঃপ্রকাশে কোন বাধা থাকেনা। বিশেষত দীর্ঘলয়ের ধ্বনিমাধুর্যের মধ্য দিয়ে দরাজ কণ্ঠে যখন গায়ক ভাটিয়ালির সুর ধরেন তখন কোন বাদ্যযন্ত্রাদির প্রয়োজন হয় না, তবে উৎসব অনুষ্ঠানে দোতারা এবং বাঁশীর সঙ্গে গান করা হয়। অধিকাংশ সঙ্গীত রসিকরা মনে করেন যন্ত্রের উচ্চনিনাদের চাপে গায়কের সুমধুর কণ্ঠস্বর ম্লান হয়ে যায়, ফলে ভাটিয়ালি তার সুরের মৌলিকতা হারিয়ে ফেলে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যন্ত্রপ্রধান ভাটিয়ালি মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন - 'বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আমরা যে ভাটিয়ালি শুনিতে পাই তাহা প্রকৃত ভাটিয়ালিই নহে - ইহাকে নাগরিক ভাটিয়ালি বলিয়া নির্দেশ করা যায়। তাঁর মতে 'বাদ্যযন্ত্র প্রায় সর্বদাই কণ্ঠস্বরের দৈন্যতা গোপন করিয়া থাকে কিন্তু যাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একদিকে গভীরতা এবং অন্যদিকে দিয়া উচ্চগ্রামে উঠিয়া যাইবার ক্ষমতা নাই, তাহার পক্ষে আর যে কোন লোকসঙ্গীত পরিবেশন করা সম্ভব হউক না কেন ভাটিয়ালি পরিবেশন করা সম্ভব হইবেনা।'

রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও ভাটিয়ালির ঢঙে রচিত হয়েছে। তিনি যখন জমিদারীর কাজ দেখাশুনার জন্য রাজশাহী ও পাবনা জেলায় ভ্রমন করতেন তখন সেখানকার মাঝিমাল্লাদের ভাটিয়ালি শুনে তিনি নিজেও কিছু কিছু গান এই সুরে রচনা করেন। যদিও রচনার ক্ষেত্রে তিনি ভাটিয়ালিতে প্রচলিত বিষয়বস্তু গ্রহণ করেননি, নিজের পছন্দের বিষয়েই গানগুলি রচনা করেছেন। পল্লী ভাটিয়ালিতে যেখানে কথা গৌণ সুরই মুখ্য, রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর অন্যান্য সঙ্গীতের মত কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর রচিত গানগুলি হল (১) খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে (২) আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি (৩) গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ।

অনেকে রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলিকে বাউল সুরের গান বলে অভিহিত করলেও একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে বাউল সুর বলে কোন নির্দিষ্ট সুর নেই, প্রত্যেক অঞ্চলের বাউল গানে সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের সুরই ব্যবহৃত হয়। আসলে বাউল, ভাটিয়ালি ও সারি গানের স্বরবিন্যাস প্রায় সমগোত্রীয় বলেই হয়ত এই বিভ্রাট, সে কারণেই হয়ত অনেকেই এগুলির মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাননা।

ভাটিয়ালি গানের সুরের যাদুতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন আমাদের ত্রিপুরার গর্ব শচীনকর্তাও, রাজপরিবারের ছেলে হয়েও তিনি এই গানের টানে ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, মাঠে ময়দানে এবং সময় কাটিয়েছেন মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে। কুমিল্লার পল্লীপ্রকৃতি, সেখানকার নদীনালা, জলাশয়, নৌকোবেয়ে মাঝির গান গেয়ে যাওয়া তাঁকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করতো। তাঁর সুরচেতনার অনেকটা স্থান জুড়ে ছিল ত্রিপুরার বাঁশের বাঁশী, ভাটিয়ালি ও মাঝিমাল্লাদের জীবন জীবিকার সুর। তাই তিনি মরমী সুরে তাঁর জনপ্রিয় বাংলা গানটি গাইলেন -

'তোরা কে যাস্‌রে, ভাটি গাঙ বাইয়া,
আমার ভাইধনরে কইও
নাইয়র নিত আইয়্যা'

এ গানের মধ্য দিয়ে নদীমাতৃক বঙ্গদেশে শ্বশুরবাড়িতে অবস্থানরত সদ্য বিবাহিত মেয়েদের

প্রাণের আকুল আর্তি ধরা পড়েছে যা দেশ কাল ছাপিয়ে গেছে।

তিনি নৌকোর মাঝিদের গান তন্ময় হয়ে শুনতেন এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন ভাবনার সমুদ্রে। জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও এই সুরকে নিয়ে তিনি নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কাজ করে গেছেন। বলা যায় তাঁর সুরসাফল্যের উষ্ণীসে ভাটিয়ালি একটি বহুমূল্য রত্ন। কারণ এই সুরের ছোঁয়ায় তাঁর বহু গান রচিত হয়েছে। নিম্নলিখিত গানটি তিনি কাহারবা তালে রেকর্ড করেছিলেন।

'ওরে সুজন নাইয়া, কোন্ বা কন্যার দেশে যাওরে,
চান্দের ডিঙি বাইয়া' (অভিরূপ, কলকাতা/ ১৯৯৮ ইং)

১৯৮৪ সালে 'শচীন দেববর্মন স্মরণিকায়' ত্রিপুরার বিশিষ্ট লেখক মহেন্দ্র দেববর্মা বলেছেন - সঙ্গীত সাধক এস ডি বর্মনের কর্মমালার একটি ফুল, বাউল-ভাটিয়ালি গানকে সঙ্গীতের পঙক্তিতে স্থান করে দেওয়া, উনার কল্যাণে এই গান তথাকথিত ভদ্রজলসায় স্থান পেয়েছে, এই গানের সৌরভ হিন্দি গানের জগৎকেও সুরভিত করেছে।'

তাই বলা যায় জন্মভূমির মাটি, বাঁশীর সুর, নদীনালা, জলাশয়, গাছগাছালি, পাখপাখালিই শুধু নয় সেই সঙ্গে ভাটিয়ালিও তাঁর সৃজনশীল শিল্পীমনকে রাঙিয়ে ছিল। আর বস্তুত এই মাটির সুরকে ভিত্তি করেই তিনি সাফল্যের শীর্ষে উঠেছিলেন যে জন্যে গর্বিত ত্রিপুরার রাজপরিবার সহ আপামর জনসাধারণ এমন কি ভবিষ্যৎ প্রজন্মও।

ব্যক্তিচেতনার গান ভাটিয়ালি ধীরে ধীরে মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে সমাজমানসে উত্তীর্ণ হয়েছে। আত্মমুখী এসব গানে বাঙালীর জীবন দর্শন ফুটে উঠেছে। সে রকম ভাবে সুরের বৈচিত্র্য না থাকলেও এই জাতীয় গানের ভাবের গভীরতা ও করুণ বিষাদময় সুরের অসাধারণ হৃদয়গ্রাহী আবেদন অস্বীকার করা যায়না। পরিশেষে বলা যায় - বাংলার প্রাণের গান ভাটিয়ালির সুরের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের জন্য কেউই একে এড়াতে পারেনি। শুধুমাত্র বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শিদি, মারফতি ইত্যাদি গানেই ভাটিয়ালি গানের সুরের প্রভাব রয়েছে তা নয়, অধিকাংশ কীর্ত্তনগানেও এর প্রভাব যথেষ্ট। গরাণহাটি, মনোহরশাহী, রাণীহাটি প্রভৃতি কীর্ত্তনগানের প্রবর্তক নরোত্তম দাসঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ ঠাকুর প্রমুখ জনেরা দ্রুপদ রাগসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ হয়েও কীর্ত্তনগানে ভাটিয়ালির সুর বহুল পরিমানে প্রয়োগ করেছেন। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, অতুল প্রসাদ সেন, রজনী কান্ত সেন ও আমাদের ত্রিপুরার শচীনকর্তা - এঁরা সকলেই ভাটিয়ালিকে এঁদের সাজানো স্বরচিত সুরোদ্যানে সযত্নে ঠাঁই দিয়েছেন, মাঝি-মাল্লার গান বলে ব্রাত্য করে দূরে ঠেলে দেননি।

* * *

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উৎস ও প্রবাহ

কল্পনা দে

সঙ্গীত এমনই একটি ললিতকলা যা মানুষের অতি উন্নত ও সুস্থ রুচি বোধের পরিচায়ক। সঙ্গীত একদিকে মানুষের নান্দনিকতা ও অন্যদিকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'ন চ বিদ্যা সঙ্গীতাদপরা' আবার একথা বলা হয়েছে 'গানাৎ পরতরং নহি'। শ্রী ভগবান নারদকে বলেছেন —

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে
যোগীনাং হৃদয়েন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি
তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।"

'সঙ্গীত' বলতে গীত বাদ্য এবং নৃত্য — এই তিনটিকেই বুঝায়। "গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে"। সঙ্গীত এদেশের সনাতন ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে, ক্ষেত্র বিশেষে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত।

সঙ্গীত চিরকালের। সৃষ্টির যে বিচিত্র লীলা অনাদিচাপল্য, অখন্ড আবেগ তা এসে মিলেছিল পাখীর দেহের ছন্দে, তারপর ধরা দিল মানবদেহের আবর্তনে, সংস্কৃতির সংস্পর্শ বিবর্জিত মানবশিশু থেকে গোটা মানুষের দেহের ছন্দে ফুটে উঠেছিল তার বাক্‌হীন আবর্তনের এক ছন্দানুভূতি বিশ্ব প্রকৃতির সেই আদিম চাঞ্চল্যের প্রেরণা অঙ্গভঙ্গীর প্রকাশের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছিল নাচের। পশু-পাখীর ডাক, বৃষ্টির শব্দ, ঝর্নার জলধারার শব্দ, নদীর কলধ্বনি ইত্যাদি অনুকরণে সৃষ্টি হল ভাষা, তারপর সুর। প্রাক্ বৈদিক যুগে গীত বাদ্য ও নৃত্যের প্রচলন ছিল। আদিম অধিবাসীরা চামড়ার বাদ্য ও হাড়ের বাঁশি সহযোগে বিভিন্ন ছন্দে নৃত্য করতো দলবদ্ধভাবে। করতালি দিয়ে তারা নৃত্য ও গীতের ছন্দ রাখতো। ওই করতালি পরবর্তী কালে 'তাল' এ পরিণত হয়েছে।

ভারতের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী ও পরম্পরাগত "সঙ্গীত" এর উৎস বৈদিক গীতবাদ্য ও নৃত্যের মধ্যে নিহিত বলে স্বীকৃত। এদেশের পরিমার্জিত ও পরিশীলিত সঙ্গীতকলার উৎস মূলে রয়েছে বৈদিক সংস্কৃতি। বৈদিক যুগের সু-সংস্কৃত ও পরিশীলিত গীতি বাদ্য ও নৃত্যের চর্চা কালক্রমে "বৈদিক সঙ্গীত" নামে কথিত। সে কারনেই "বৈদিক সঙ্গীতকে"ই ভারতের সঙ্গীতকলার

উৎস বলে মানা হয়েছে। এ দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান নিদর্শন হল ঐহিত্য বাহী সঙ্গীত (সামগ্রিকভাবে) যা প্রাচীন যুগ থেকে বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এবং এই যাত্রাপথে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। এই পরম্পরাবাহী ঐতিহ্যমন্ডিত সঙ্গীত কলাই বর্তমানে 'শাস্ত্রীয় সঙ্গীত' নামে পরিচিত।

বেদ-উপনিষদের যুগে নৃত্য গীত চর্চা সার্বজনীনভাবেই সমাজে আদৃত ছিল।

বেদ-উপনিষদের সঙ্গীতের মূল কোথায় কেনই বা তা মন আকর্ষণ করে,এবং কেন গান একটা অনির্দেশ্য আবেগে প্রাণপূর্ণ করে তোলে ও মন উদাস করে। চিন্তার গভীরতর স্তরে নেমে গিয়ে তাঁরা একদিন অনুভব করলেন যে "সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণ-কম্পন চলেছে গান শুনে সেইটারই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তে অনুভব করি।" তারা আরো জানালেন যে, "সমস্ত মানব জীবনও অনন্তের রাগিনীতে বাঁধা একটি সঙ্গীত ছাড়া কিছুই নয়" এবং সূর্য-চন্দ্র-তারা ওষধি-বনস্পতি সকলেই এই বিশাল বিশ্ব সঙ্গীতে নিজের একটানা একটা বিশেষ সুর যোগ করে দিয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো দেশ সঙ্গীতকে এভাবে উপলব্ধি করে নি। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্যের সার্থক ইতিহাস শুরু হয় সম্ভবত সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণগুলির মধ্য দিয়ে। এই মহাকাব্যের যুগ শেষ হতেই নৃত্যের মূলধারা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়েছে। এই দুটি ধারা হল — উচ্চাঙ্গ নৃত্য এবং লোকনৃত্য।

বৈদিক যুগে সঙ্গীত যথেষ্ট উন্নত ছিল। গানের সঙ্গে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এবং সেইসঙ্গে নৃত্য এই সময় থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল। ক্ষৌনী, আঘাতি, খাতলিকা, কান্ডি কাত্যায়নী, পিচ্ছোরা প্রভৃতি বেনু ও বীনার নাম পাওয়া যায়। চামড়ার যন্ত্র হিসাবে ছিল দুন্দুভি, ভূমি-দুন্দুভি প্রভৃতি। এছাড়া গর্গর, পিঙ্গ নাড়ী, বনস্পতি, অদম্বর কর্করি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। বান-বীনার একশটি তার থাকতো, গোধাবীনা গো-সাপের চামড়া দিয়ে তৈরী হতো। ধনুযন্ত্রের উল্লেখও বৈদিক সাহিত্যে রয়েছে। এই ধনুযন্ত্র থেকে পরবর্তী যুগে বেহালার সৃষ্টি হয় বলে কেউ কেউ ধারণা করেন। চারিটি বেদের মধ্যে সঙ্গীত প্রসঙ্গে সামবেদই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। সামবেদের গ্রামগেয় শ্রেণীর গান নির্দিষ্ট ছিল গৃহবাসী, গোষ্ঠী ও সাধারন শ্রেয়কামীদের জন্য। বৈদিক গান বা সামগানের নিয়মবিধি খুব কঠোরভাবে পালন করা হতো এবং ব্রাহ্মনগোষ্ঠী ছাড়া এই গান গাওয়া বা শোনার অধিকার কারো ছিল না। এজন্য এই সামগানকে সহজ সরল রূপে গাইবার পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল। এই গান শৈলীকে বলা হতো 'সামেতর গান'। অনুমান করেছেন পন্ডিতরা যে, সামেতর গান পরবর্তীকালের গ্রামগেয় গানকে প্রভাবিত করেছে। এই গ্রামগেয় গানই পরে 'গান্ধর্ব সঙ্গীত' -এর উৎসরূপে স্বীকৃত হয়েছিল।

গান্ধর্ব সঙ্গীত হল বীনাদি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে স্বর তাল ও পদযুক্ত সঙ্গীত। গান্ধর্ব সঙ্গীতের দুটি শ্রেণী-মার্গ ও দেশী। মার্গ সঙ্গীত বলতে যে গান ছিল অভ্যুদয়িক, অধ্যাত্ম উন্নতিকারক, পবিত্র বা অপার্থিব, মার্গ সঙ্গীত বৈদিক সঙ্গীতের উপাদান ও রীতি নীতি নিয়ে রচিত। আর্যরা ভারতে আসার আগেই দ্রাবিড় ইত্যাদি অনার্য জাতিরা ভারতে ছিল। তাদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার নৃত্যগীতকেই দেশী সঙ্গীত বলে। তা আর্য সঙ্গীতের সঙ্গে মিশেছিল। প্রকৃতপক্ষে

প্রাচীন গার্ন্ধব গানই পরবর্তীকালে পরিবর্তিত আকারে এবং উপাদানে দেশী সঙ্গীত রূপে আখ্যাত হয়। তাই দেশী সঙ্গীত বলতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে ভিত্তি করে বিভিন্ন রাজ্যের গড়ে ওঠা সঙ্গীতকেই বুঝায়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন-"গ্রামগেয় গান থেকেই বৈদিকোত্তর গার্ন্ধব বা মার্গ এবং মার্গ থেকে ক্রমশঃ ক্লাসিক্যাল অভিজাত দেশী গানের সৃষ্টি হয়েছে।" বস্তুতপক্ষে প্রাচীনযুগের দ্বিতীয়ার্ধে মার্গ সঙ্গীত ও তৎকালীন পরিশীলিত অভিজাত দেশী সঙ্গীতের সুষম মিশ্রনের মাধ্যমে উপজাত একটি সঙ্গীত ধারা প্রবাহিত হতে থাকে যা মার্গ দেশী সঙ্গীত নামে অভিহিত এবং এই মার্গ দেশী সঙ্গীতই পরবর্তী কালের 'রাগ সঙ্গীত' বা 'শাস্ত্রীয় সঙ্গীত' এর উৎস।

মধ্যযুগের প্রথমার্ধকে প্রবন্ধ গানের যুগ বলা হয়। 'প্রবন্ধ' শব্দটির অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে বদ্ধ বা প্রকৃষ্ট বন্ধন যুক্ত গান। এই প্রকৃষ্ট বন্ধন হল স্বরপদ তাল আশ্রিত। প্রবন্ধ গানের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিশেষভাবে দৃষ্ট হয় মূলতঃ ধ্রুপদ গান, বিভিন্ন ভজনগান, কীর্তনগান ইত্যাদিতে। মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধে থেকে আধুনিক যুগে বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়টি মূলতঃ ধ্রুপদ গানের যুগ রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই যুগে রাগ রূপায়নের ক্ষেত্রে রুদ্রবীণা, রবার, সুরশৃঙ্গার ও সুরবাহার প্রভৃতি তন্দ্রবাদ্য এবং পাখোয়াজ তালবাদ্য হিসেবে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। তার পরবর্তী পর্যায়কে মূলতঃ 'খেয়াল গানের যুগ' বলা হয়। এই যুগে রাগ রূপায়নের ক্ষেত্রে মূল তন্ত্রবাদ্য হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেছে সেতার ও সরোদ — এই উভয় বাদ্যের পরেই বেহালা এবং তালবাদ্যের ক্ষেত্রে প্রধান স্থান অধিকার করেছে তবলা। এই ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন সঙ্গীতধারা উত্তর ভারতীয় এবং দক্ষিণ ভারতীয় এই দুটি ধারায় বিভক্ত হয় খ্রীষ্টিয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে। উত্তরভারতে উত্তরী বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নামে এবং দক্ষিণ ভারতে দক্ষিণী বা কর্নাটিক সঙ্গীত নামে অভিহিত হয়েছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে মধ্যযুগের সূত্রপাত হয় ইসলামী সুলতানদের আমল থেকে। এই সময় প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ইসলামী অর্থাৎ পারস্য সঙ্গীতের মিশ্রণ হতে শুরু করে ফলে ভারতীয় সঙ্গীত একটি নতুন রূপে গড়ে উঠতে থাকে। ইসলামী শাসকরা তাঁদের রুচি অনুযায়ী বেশ কিছু পরিবর্তন করেছিলেন সঙ্গীতের প্রয়োগশিল্পে। এই সময় সঙ্গীত বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগেও নতুনভাবে বৈচিত্র্যমন্ডিত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই মধ্যযুগের সূচনা কালে ভারতীয় সঙ্গীতের বেশ কিছু গুনী সঙ্গীতজ্ঞের সন্ধান পাই যেমন — শেখ বাহাউদ্দিন জ্যাকেরিয়া, নায়ক গোপাল, আমীর খসরু, বৈজুবাওয়া প্রমুখ। এঁরা সকলেই ভারতীয় সঙ্গীতকে নতুন রূপদান করেছিলেন। আকবরের সময় থেকেই দরবারী সঙ্গীতের প্রচলন হয়। রাজা মানসিং মন্দির চত্বর থেকে ধ্রুপদ গানকে দরবারে উন্নীত করেছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এরপরই যে যুগের সূত্রপাত ও যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ রূপের উদ্ভব তার উৎসভূমি হলেন মিঞা তানসেন। তিনি শুধু যে ধ্রুপদগানের পুনরুজ্জীবন ও সম্পূর্ণতা দান করেছেন তা নয়। দরবারী কানাড়া, 'মিঞা কি টোড়ী' প্রভৃতি গভীরতর ভাব প্রকাশক রাগ সৃষ্টি ছাড়াও রবা যন্ত্রের আবিষ্কার করেছিলেন। কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীতে ভারতীয় ধ্রুপদী রাগের অবিস্মরণীয় রূপ বৈচিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। উত্তর ভারতের মিঞা তানসেনের মতো দক্ষিণ ভারতের কর্নাটক সঙ্গীতে ত্যাগরাজ গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে আছেন। তাঁর জীবনীপাঠ করার অর্থই হলো

কর্নাটিক সঙ্গীতের ইতিহাস পাঠ। তিনি কেবল সুগায়ক নন, উচ্চাঙ্গের বীনা বাদকও ছিলেন।

মধ্যযুগের নবাবী আমলে নৃত্যছিল বিলাসের অঙ্গ। তাই দেখা গেল ভারতীয় আদর্শে স্বর্গীয় নৃত্যগীতের ধারা নবাবদের জলসাঘরে চিত্তবিনোদনের সামগ্রী হয়ে ধরা দিল এক চটুল ভাবের প্রকাশে। মুসলমানদের আক্রমনে উত্তর ভারত বার বার বিধস্ত হয়েছে কিন্তু দক্ষিণভারতকে সেভাবে নাজেহাল হতে হয় নি। উত্তর ভারতের নবাবরা মন্দিরের দেবদাসীদের মন্দির থেকে হারেমে নিয়ে এলেন তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য। যে কারনে উত্তর ভারতে মন্দির কেন্দ্রিক নৃত্য কলার অবক্ষয় ঘটে, এরফলে অনেক দেবদাসী নবাবদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নৃত্যকলার স্বর্গীয় সুষমাকে পর্যবসিত করলো চটুল আবেগ ও ভঙ্গীতে কিন্তু দক্ষিণ ভারতের রায় বংশ এবং শিবাজীর অভ্যুদয়ের ফলে হিন্দু মন্দির রক্ষা এবং দেবদাসীদের মন্দিরে নিশ্চিত নৃত্যচর্চার সুযোগ ঘটেছিল। ফলে পরবর্তীকালে সেই রূপটি উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যে ধরা পড়েছে। বিলাসী সংস্কৃতি অনুরাগী নবাবদের পৃষ্টপোষকতায় হিন্দু মুসলমানের মিলনে ভারতীয় সঙ্গীতের নব কলেবর বিকশিত হল। উত্তর ভারতের কত্থক নৃত্যে সেলামী, ভাও টুকরা ইত্যাদিতে ইসলামী প্রভাব আজো অব্যাহত আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। সে সময় সঙ্গীত তার যথার্থ স্থান থেকে চ্যুত হয়। বিশুদ্ধ সঙ্গীত চর্চ্চা প্রায় বন্ধই হয়ে পড়ে। তবে সংস্কৃতি ধ্বংসের সেই যুগেও কয়েকজন অসামান্য গুণী সঙ্গীতজ্ঞ যেমন পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডে, বিষ্ণু দিগম্বর পলুসকর প্রমুখরা শাস্ত্রীয় গানের ঐতিহ্য ধারাকে সযত্নে রক্ষা করে বহমান রেখেছেন যা আজো প্রবাহিত এবং চিরকালই প্রবহমান থাকবে। উনবিংশ শতাব্দী ভারতীয় সংস্কৃতিধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পাশ্চাত্য প্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে জাগে নবজাগরণের জোয়ার। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের মুক্তি ঘটালেন। নৃত্যকে নিয়ে এলেন পবিত্র আলোর উৎসে। ভারতীয় নৃত্যের পূর্ণনবীকরনে এবং নবমূল্যায়নে তাঁর অবদান অপরিসীম। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠা করলেন রবীন্দ্র-ভারতী সেখানে ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্য ভরতনাট্যম, কথাকলি, মনিপুরী, কত্থক, কুচিপুড়ি, ওড়িশী প্রভৃতি নৃত্যের চর্চা শুরু হল।

ভারতীয় সঙ্গীতের বহমান ঐতিহ্যের মূলে রয়েছে গুরু শিষ্য পরম্পরা। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের গুরুকুল প্রথা মধ্যযুগে সুস্পষ্টরূপেই ঘরানা প্রথায় রূপ নিতে শুরু করে। মোগল সম্রাটদের পৃষ্টপোষকতায় উত্তরভারতে বিভিন্ন ঘরানার প্রবর্তন হয়। একই রাগে গায়ন ভঙ্গির অতি সুক্ষ্ম পার্থক্যের বিচিত্র ধরণের সুক্ষ্ম স্বাতন্ত্র আবেদন সৃষ্টি করার দ্বারা বিভিন্ন ঘরানার সঙ্গীতচর্চা ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তহীন বৈচিত্রে সমৃদ্ধ সাধন করেছে। এই ঘরানা শিক্ষার ধারা চলেছে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। ইসলামী সংস্কৃতিতে এই সঙ্গীতচর্চা যে বিস্তার লাভ করেছে এবং নানা ধরনের যন্ত্র সহযোগে বা শুধুই যন্ত্রসঙ্গীতে যে বিচিত্র রূপলাভ করেছে তার সমস্তটাই এই ঘরানা শিক্ষার ধারাতেই, নৃত্যের ক্ষেত্রেও তাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনে নানা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। নব্য শিক্ষিত সমাজে সঙ্গীত অর্থাৎ গান, বাদ্য, নৃত্য চর্চা বাঈজিদের সমাজ থেকে বাইরে বিস্তারলাভ করে তখন সূচনা হয় বিভিন্ন সঙ্গীত বিদ্যালয়ের। প্রচলন হয় তখন থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার। তারপর ধীরে ধীরে বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীত শিক্ষাও

যুক্ত হয়ে যায়। এই ব্যাপারে পুরোধা ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের পাঠ্যসূচিতে তিনি যুক্ত করেছেন গান, বাদ্য ও নৃত্যকে। তারপর থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে শুধু বিদ্যালয় নয়, সঙ্গীত শিক্ষার কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন - 'লক্ষ্ণৌ ম্যারিস কলেজ', এলাহাবাদ প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি, 'চন্ডীগড় সঙ্গীত বিশারদ কলেজ' ইত্যাদি। সঙ্গীত শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করলে জানা যায় যে ''বরোদা রাজ্য সঙ্গীত বিদ্যালয়ই'' প্রথম রেকর্ড স্থাপন করেছে। তাছাড়া রয়েছে সঙ্গীত গুরুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেমন - সদ্য প্রয়াত বিখ্যাত সরোদিয়া আলি আকবর খানের প্রতিষ্ঠিত 'আলি আকবর কলেজ অফ্ মিউজিক'। এইসব প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার ঘটলেও ঘরানা শিক্ষা যে সংকুচিত হয়েছে তা নয়। পাশাপাশি এই দুই শিক্ষা ব্যবস্থাই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারাকে প্রবহমান রেখেছে। অপসংস্কৃতির বেনোজল ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পুণ্যধারাকে স্পর্শও করতে পারবে না। স্বর্গের মন্দাকিনী ধারার মতো শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারা বয়ে চলবে নিরন্তর ভারতের এই অমৃতবাণীকে বহন করে-

'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'

তথ্য সূত্র ঃ

১। সঙ্গীত দর্শিকা — ক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। ভারতীয় সঙ্গীতের কথা — প্রভাত গোস্বামী
৩। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস — স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৪। নাট্যশাস্ত্র — ভারত
৫। তন্ত্রবাদ্যে অনিবদ্ধ রাগ রূপায়ন/আলাপের ক্রম বিবর্তন-ডঃ আরতী দাস
৬। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র — বি, চৈতন্যদেব
৭। নৃত্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ — ডঃ ইন্দ্রানী রায়
৮। A Historical Study of Indian Music - Swami Pragyananand.

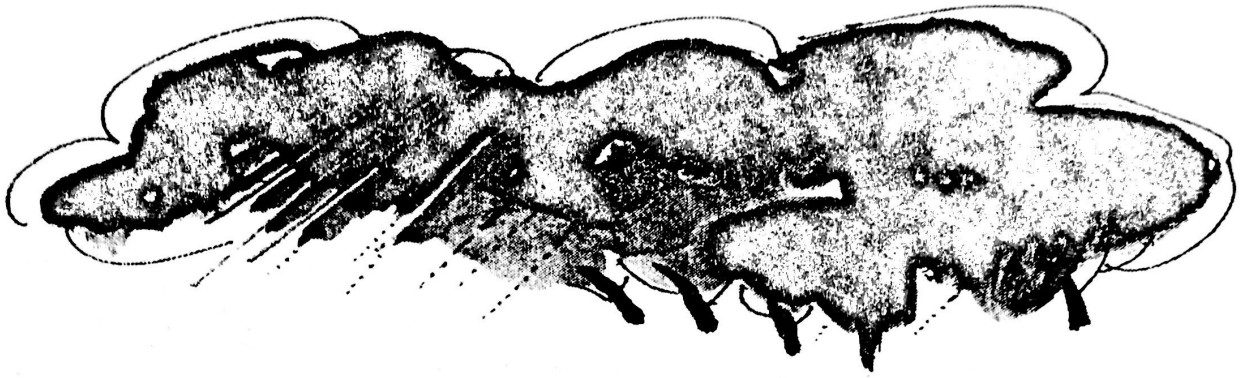

বারি ঝরে ঝরো ঝরো ভরা বাদরে

মিলি সাহা

যিনি আমাদের সহজসুরে চলতে শিখিয়েছেন এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যুগিয়েছেন আমাদের সবরকম অনুভূতির ভাষা। তিনি আর কেউ নন। তিনি হলেন আজন্ম প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতির ছয়টি ঋতুই তার রূপ রস গন্ধ নিয়ে আমাদের জীবনে আসে। রবীন্দ্রনাথ এই ছয়টি ঋতু নিয়েই তার কবিতা ও সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। বিদ্যাসাগরের 'জল পড়ে পাতা-নড়ে' এই বাক্য দুটির কাব্যময় বিস্তার ঘটেছিল তাঁর জীবনে। কিন্তু পরিবারের গুরুজনদের নির্দেশে বাড়ীর বাইরে যাওয়া বারণ ছিল। এমনকি বাড়ীর ভেতরেও যেখানে সেখানে যাতায়াত করা যেত না। ফলে প্রকৃতিকে দেখতে হয়েছে জানালার ফাঁক দিয়ে কিংবা বড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে। এ প্রসঙ্গে 'জীবন স্মৃতির' এক জায়গায় কবি লিখেছেন - "প্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম।"

তারপর বয়স বাড়ার পর যখন কবি শান্তিনিকেতনে যান, সেখানে প্রকৃতিকে পেয়েছেন নিবিড় করে এবং তাকে উপলব্ধি করেছেন গভীরভাবে। ফলে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। শান্তিনিকেতন এবং পদ্মাপারের নিসর্গ প্রকৃতিই তাঁকে সঙ্গীত সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছিল। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গীতের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্কে কবি তাঁর সঙ্গীত চিন্তা নামক গ্রন্থে লিখেছেন — "প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিবিড় সম্পর্ক এমন আর কিছু না"। রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে ঋতুটির প্রভাব সবচাইতে বেশী, সেটি হল বর্ষা। বর্ষার গানগুলিতে কবির বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার ঘটেছে। কোথাও বর্ষার ঋতুপ্রকৃতির বর্ণনা বর্ণগন্ধে পুলকিত, আবার কোথাও মৃত্তিকার ঘ্রাণ, কোথাও উদাসী মনের বিরহ বেদনা, কোথাও বা মিলনের তীব্র আকাঙ্খা। বর্ষার নৈসর্গিক রূপ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলিতে অপরূপতা লাভ করেছে। গীত বিতানে বর্ষা সঙ্গীতের সংখ্যা মোট ১১৫টি। বর্ষা সঙ্গীতগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, যে গানটি দিয়ে কবি বর্ষাকে আবাহন করেছেন, সে গানটি হলো —

এসো শ্যামল সুন্দর
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা
বিরহিনী চাহিয়া আছে আকাশে।

এই গানটির মধ্যে ধরণীর তাপিত, তৃষ্ণার্ত ও বিরহ রূপটি ফুটে উঠেছে।

আবার নববর্ষার আগমনে কবির মন যেন আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তাই কবি গেয়ে উঠলেন —

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে।

বর্ষার এই গানটিতে বিরহী চিত্তের প্রতীক্ষা ভিন্নতর মাত্রা এনে দিয়েছে। বাগেশ্রী রাগে রচিত অসামান্য একটি গান এ প্রসঙ্গে একটুখানি উল্লেখ করা গেল —

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার।

এখানে অভিসারে বেরিয়েছেন পরানসখা বন্ধু। ফলে পদাবলীর অভিসারের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে এ গানটির মধ্যে। এই অভিসার কখনো লোকায়ত প্রেমের দিক থেকে ঘটেছে, কখনো পরানসখা অর্থে ঈশ্বর ও কবির অভিপ্রেত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কালিদাসের সংযোগ সূত্র স্থাপন করেছে এই গানটি।

বহু যুগের ওপার হতে
আষাঢ়, এল আমার মনে

এখানে আষাঢ় যেন বিরহী যক্ষের আষাঢ়ের প্রথম দিবস, যেদিন তার প্রিয়ার কাছে মেঘকে দূত করে পাঠিয়েছিল। স্মৃতির বেদনায় যেন মেঘাবৃত শ্রাবণ আকাশ ছায়াচ্ছন্ন। ১৩৪২ সালের ২১ শে শ্রাবন এই গানটি লেখা হয়েছে।

আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবনরাতি
স্মৃতি বেদনার মালা একেলা গাঁথি।

এখানে বর্ষামুখর শ্রাবণরাতের বিরহ গভীর হয়ে উঠেছে এবং এই বিরহ অতীত স্মৃতির উন্মথিত বেদনা। সঙ্গতভাবেই মনে হচ্ছে এই স্মৃতি মিলনের।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানে আমরা পাই শূন্যতা, ব্যর্থতা ও একাকীত্ব। ঝর ঝর বর্ষণে বিপন্ন ও সংকটগ্রস্ত অবস্থায় পড়তে হয়েছে পথচারীকে। মল্লার রাগে রচিত এ গানটি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে।

ঝর ঝর বরিষে বারি ধারা
হায় পথবাসী, হায় গতি হীন।
হায় গৃহহারা।

এইভাবে বর্ষার গানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সারা জীবন প্রকৃতির নিগূঢ় সান্নিধ্যে থাকার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে কবির একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। বর্ষা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সব সময় বিরহের রূপই প্রকাশ পেয়েছে। কালিদাসের মেঘদূত রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, পাওয়া না পাওয়ার বেদনা মিশ্রিত আকুলতা, এ সবই কবির গানে ব্যক্ত হয়েছে। পুরনো বছর শেষ হয়ে যেমন নতুন বছর আসে তেমনি ঋতুর আবর্তনও মানুষকে জীবনে এনে দেয় গতির আনন্দ। পরিশেষে বলা যায় বর্ষা আসুক আমাদের সকলের জীবনে বার বার। ভালোবাসার বারিপাতে আমাদের মন সিক্ত হয়ে উঠুক।

সেই দিনগুলি

শ্যামল দেব

জীবন বড়ো বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যময় জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার মধ্যে কিছু কিছু আছে যা বর্তমানকে সুদুর অতীতে নিয়ে গিয়ে স্মৃতি মন্থনে উদ্দীপনা জাগায়, জাগায় তখনকার দৃশ্যপট।

আমার দীর্ঘ সময়ের তবলা বাদন কালে এমন কিছু সঙ্গীত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম যা লিখতে এই কলম ধরা।

তবলা শিক্ষার সূত্রে আমি কলকাতা পাড়ি দিয়েছিলাম 1980 সনের জুলাই মাসের 24 তারিখ। কলকাতা রেডিওতে যুববাণী বিভাগে মনোনীত হই 1984- এর 7 ই মার্চ। এক বছর যুববাণীতে বাজানোর সমান All India Radio তে গ্রেডেশন পরিক্ষায় বসি। 1985- এর 14th March সম্মানের সঙ্গে M.A.B. বোর্ড দিল্লি আমাকে B-High গ্রেডেশন প্রদান করেন এবং আমিই ত্রিপুরার সর্বপ্রথম B-High আর্টিষ্টের সম্মান লাভ করি। সেই থেকে কলকাতা রেডিওতে ১০ বছর বিশিষ্ট সঙ্গীত ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্যে সম্মানের সঙ্গে সঙ্গত করতে গিয়ে যা পেয়েছি তার কিছু কিছু আজ লিখছি।

একবার রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিক্‌পাল শ্রী সুবিনয় রায় -এর সাথে বাজাব, যথারীতি উনাকে প্রণাম করলাম এবং বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'আমি এই প্রথম আপনার সাথে বাজাচ্ছি, ঠেকা বাজাতে যদি ভুলত্রুটি হয়, বলে দিলে সেরূপ বাজাতে চেষ্টা করব। উনি বললেন, 'আগে তুমি বাজাও তারপর বলাবলি।' ধরলেন 'বাপীত ধায়।' আগেই আমি রবীন্দ্রভারতীতে বিখ্যাত পাখোয়াজ বাদক স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শ্রী রাজীব লোচন দে মহাশয়ের নিকট পাখোয়াজের কিছু তালিম নিয়েছি চৌতালের ঠেকাটা ভাল করেই শিখিয়েছিলেন। বাজালাম নিজের চিন্তায়। গান শেষে হতেই উনি বললেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ন্যাকামি করছিলে।' আমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু ভুল হয়েছে কি? উনি বললেন, 'কি ঠেকা বাজিয়েছ, চ্যুটিয়ে বাজাও।' অনুষ্ঠান শেষ করে আমাকে বললেন, 'তুমি ক্লাসিক্যালটা আরো ভাল করে শেখ।' আজ এই মানসিকতারই বড় অভাব। ঠিক একই কথা রুনু গুহ ঠাকুরতা আমাকে বলেছিলেন।

আর একটি ঘটনা 1989- এর 7th জুলাই। এমনিতেই কলকাতার আকাশবানীতে গেলাম। তখন PEX ছিলেন অসীমা মুখ্যোপাধ্যায়। দোতলায় উঠার সঙ্গে সঙ্গে অমলেন্দু চৌধুরী (সেতারের স্টাফ আর্টিষ্ট) আমাকে বললেন, 'শ্যামল একটা রেকর্ডিং আটকে আছে একটু তুলে দে-না।' আমি শিল্পীর নাম জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম তিনি বিখ্যাত সরোদ শিল্পী উস্তাদ বাহাদুর খাঁ সাহেব। আমি প্রস্তুতি ছাড়া উনার সঙ্গে বাজাবনা বলাতে অসীমা মুখার্জী এসে বাজাতে বললেন, না করতে পারলাম না। হাতুড়ী পাউডার চেয়ে ভয়ে ভয়ে বসলাম। আমার দিকে একবার তাকালেন, আমি প্রণাম করলাম। তবলা মিলালাম। উনি আলাপ বাজাতে শুরু করেই মাথাটা যে সরোদের দিকে নামালেন একবারে শেষ করে তুললেন। গৎ ধরতেই আমি ছোট্ট একটি

উঠান বাজিয়ে সমে এসেছি। মনে সাহস পেলাম। তারপর যে কাজই আমি তবলায় করেছি। আমার মনে হয়েছে উনি যেন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আসলে বাজাতে গিয়ে যা বুঝেছি লয়ের সব রাস্তাগুলি উনার জানা থাকায়, বাজানোর সময় আমার বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে চলার যে মহানতা, তাই প্রকাশ পেয়েছে। ব্রডকাষ্ট সেদিন হল তারপরে রবীন্দ্রভারতীর সরোদের প্রফেসর দেবাশীষ আমাকে বলেছিলেন সঙ্গতটা নাকি খুব সুন্দর হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এক মাস পরে উনার দেহান্ত হয়। রেডিওতে গেলাম। অমলেন্দুদা বললেন শেষ রেকর্ডিংটা তোর সঙ্গে করে গেলেন। উনি আরও বললেন, এই ক্যাসেটটা প্রিজার্ভ করা থাকবে। বর্তমানে প্রসার ভারতী বিখ্যাত শিল্পীদের ক্যাসেটগুলি CD করে জনসাধারণের জন্য বিক্রি করছেন-হয়ত একদিন উনারও ক্যাসেট বেরোবে তাতে, তবলা সহযোগিতায় শ্যামল দেব এই নামটিও ছাপানো থাকবে।'

অতীতকে স্মৃতিপটে আনলে তা বাঁধ মানে না ক্রমশঃ ছুটতে থাকে। আর একটি ঘটনার কথা লিখছি —

'সুপ্রভা সরকার' সবার পরিচিত, একজন বিখ্যাত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে। আকাশবাণীতে উনার রেকর্ডিং সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে, সেদিন আমার ডিউটি ছিল। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়র দাদা, নামটা মনে পড়ছেনা, পদবিটা ব্যানার্জী এসে বললেন, শ্যামল ১২নং স্টুডিওতে সুপ্রভা সরকার বসে আছেন তুমি একটু ধর আমি চা-খেয়ে আসছি। আমি আনন্দিত, উনার সঙ্গে বাজানোর সুযোগ আসাতে। সেই স্টুডিওর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম আমাকে উনি দেখলেন এবং জানতে চাইলেন আমার নাম। আমি বললাম, শ্যামল দেব। উনি বললেন, তোমারতো আমার সঙ্গে বাজানর কথা নয়। আমি সত্য বললাম। উনি এমন ক্রোধান্বিত হলেন যে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এমন সব বিশ্রি গালাগাল দিতে লাগলেন সেই ব্যানার্জীদাকে তা শোনার অযোগ্য। কমল মল্লিক (সরোদ বাদক) রেকর্ডিং করছিলেন উনি ফুল ভলিয়ম দিয়ে দিলেন। প্রায় ১৯টার মত স্টুডিও গম গম করতে লাগল। আওয়াজ শুনে PEX অসীমা মুখার্জী এলেন। বোঝানোর চেষ্টা করে থামালেন। ব্যানার্জীদা ক্ষমা চাইলেন, বললেন দিদি আমি বাজাচ্ছি, আপনি গান করুন। তখন বললেন, 'তুমি এখন ভাল করে বাজাবে না।' যাক্ সেদিন কোন রকমে ম্যানেজ হল। এর অনেক পরে একদিন উনার সঙ্গে আমার বাজানোর সিডিউল হল। পূর্বের ঘটনা মনে পড়ে গেছে। ৮নং স্টুডিওতে ক্লাসিকাল রেকর্ডিং চলছিল সেখানে সবার বড়দা অর্থাৎ শ্যামল বোস আমাকে ধরে উনার একটা প্রোগ্রামের কথা বলছিলেন। এদিকে সুপ্রভাদির রেকর্ডিং এর সময় হয়ে গেছে। বড়দার গল্প শেষ হচ্ছে না। বলে কয়ে উনার কাছ থেকে বেরিয়ে বিপদ জেনে একটা বিড়া হাতে করে উনার স্টুডিওতে ঢুকলাম। তুমিই কি আমার সাথে বাজাবে? তা এত দেরী হল কেন? বলতেই আমি বললাম বিড়া খুঁজতে দেরী হয়ে গেল। শোনা মাত্র অন্য রূপ দেখা গেল। আমাকে উনার কাঁধের ব্যাগটা দিয়ে তবলায় ঠেস দিয়ে বাজাতে বললেন, তাতেও যখন তবলাটা নড়ছিল তখন গায়ের পশমি কালো কুচকুচে শালটা ভাজ করে দিয়ে দিলেন এবং শেষে বললেন, তোমার মুখটা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে, এভাবে কি তবলা বাজান যায়। সেদিন ১ঘন্টার রেকর্ডিং ছিল ৩০ মিনিট করে আর করলেন না। সেদিন

দেখলাম, তাঁর স্নেহ-মমতা একজন সহকারী শিল্পীর অসুবিধায় মর্মাহত হওয়া এবং ব্যথিত হওয়া এই দুই চরিত্রের বিচার করে আপনারা ঠিক করুন তাঁকে কোনটাতে রাখবেন। আমি কিন্তু উনার কণ্ঠে 'অঞ্জলি লহ মোর' গানখানির সুর এবং তীক্ষ্ণতা, আজও অদ্বিতীয় হিসাবে কানে বসে আছে এবং থাকবে।

28th July 1986 - এ রেকর্ডিং করলাম অনুপ ঘোষালের সঙ্গে। সত্যজিৎ রায়ের 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' এর শিল্পী হিসাবে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তবলা মিলালাম কি গাইবেন কিছুই জানিনা। গান ধরলেন আধুনিক। বাজাতে আরম্ভ করলাম। বাজাচ্ছি হঠাৎ দেখলাম উনার বা হাতটা বেলো ছেড়ে উপরে তুলে মুঠ করে আবার বেলো বাজাচ্ছেন। আমি ভীষণ তটস্থ এবং সতর্কতার সঙ্গে ৬টা গান বাজিয়ে শেষ করলাম। রেকর্ডিং শেষে অন্য যারা সহযোগিতা করেছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার কি লয় বেড়ে যাচ্ছিল, সবাই বলল, না, ঠিকই তো ছিল। বললাম তবে যে উনি বার বার মুঠ করে লয় কমানোর ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। ওরা বলল, ওটা ওনার মুদ্রা দোষ। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

প্রথম দিকে আমি ৩নং কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রীটে থাকতাম। কলকাতার ভাষা পরিস্কার বলতে পারতাম না তাই বাড়ীতেই থাকতাম এবং খুব রেওয়াজ করতাম। এমনই একদিন রাত ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রেকটিস করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোর বেলা আমার বাড়ীর মালিকের ডাকে জাগালাম। উনি বললেন স্নান খাওয়া করে নাও। কাল রাতে তুমি যখন বাজাচ্ছিলে তখন অরোরা ফিল্ম স্টুডিওর মালিক তোমার বাজনা শুনে বলেছেন যে স্টুডিওতে যেন আজ তোমাকে নিয়ে যাই। তুমিই তবলাটা বাজাবে। তৈরী হয়ে উনার সঙ্গে গেলাম। ইনি সেতার নিলেন, উনিও বাজাবেন। স্টুডিওতে গিয়ে দেখলাম সেখানে দুর্বাদল চট্টোপাধ্যায় (ভাইলিন) এখনকার এ্যারেঞ্জার। বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি সরাসরি বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ছাত্র। ছোট ছোট কাট হয়েছে। আমি সবার সঙ্গে তবলাটা বাজালাম ভাল রেকর্ডিং হয়েছে। পরে জানলাম এটা নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের একটা ডকুমেন্টারী ফিল্মের জন্য করা হয়েছে। আমার বাজনা শুনে দূর্বাদল চট্টোপাধ্যায় উনার বাড়ীতে নিয়ে গেছেন, বলেছেন সময় পেলে যেন যাই। প্র্যাকটিস্ করা যাবে।

1983 রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পারকাশন' এর উপর অর্থাৎ তবলা, পাখোয়াজ এবং খোল এর উপর হাইয়ার ডিপ্লমা পড়ছি। তখন ইনস্ট্রুমেন্ট ডিপার্টমেন্টে বাবা আলি আকবর খাঁ সাহেবের মেয়ের জামাই প্যাড়েড়া সাহেব মাইহার ব্যান্ডের অনুকরণে একটি অর্কেষ্ট্রা রিহার্সাল করাচ্ছিলেন। আমার ক্লাস শেষ হলে রিহার্সাল শুনতে যেতাম। একদিন তবলা যিনি বাজান তিনি আসেননি। সেই সময় শিশিরকণা ধরচৌধুরী ডিপার্টমেন্টাল হেড ছিলেন। বন্ধুরা শিশির-দিকে আমার কথা বললেন তবলা বাজানোর জন্য। আমি বাজালাম। এতবড় সুযোগ ছাড়তে চাইন। শিশিরদির পছন্দ হল। ঠিক হল আমিই প্রোগ্রামে বাজাব।

আমাদের প্রোগ্রামের পর সরোদ বাজাবেন উস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেব, তবলায় পন্ডিত স্বপন চৌধুরী।

আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার আগে দেখি স্বপন চৌধুরী স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে। আমি

তবলাটা নিয়ে মিলিয়ে দিতে বললাম। উনি মিলিয়ে দিলেন এবং বললেন তুমি একটু দেখে নও। আমি লজ্জায় বললাম এতবড় দুঃসাহস আমার হবে না। শুনে উনি বললেন, 'দেখ, আমি যেই এ্যাঙ্গেলে মিলিয়েছি তোমার বাজানর এ্যাঙ্গেল ভিন্ন রকম হতে পারে তাই দেখে নেবে।' এই কথাতেই বুঝতে পেরেছিলাম উনি কত বড় মাপের শিল্পী। তার বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বাড়িয়ে দিল। আমি একটা নতুন জিনিষ জানলাম। আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হল। কলকাতার সব বড় বড় শিল্পীরা সামনের সারিতে বসে শুনছেন। হল উপচে পড়া ভিড় বসার জায়গা নেই। আলি আকবর খাঁ-এর বাজনা শোনার এবং দেখার এত ভিড়। আমাদের বসার জায়গা নেই তাই সবাই স্টেজে বসলাম। আমি একেবারে খাঁ সাহেবের সঙ্গে এবং সামনা সামনি অবস্থায় অর্থাৎ যাকে বলে মুখোমুখি। আলাপ শেষে জোড় বাজাচ্ছেন আমি তাল রাখতে শুরু করলাম, কখন সে লয় হারিয়ে গেছে বলতে পারিনি। এক সময় খাঁ সাহেব বাজনা থামিয়ে হাতে তাল দিয়ে লয়টা ধরিয়ে দিলেন। আমার জীবনে এক অমৃত মূহুর্ত যেন কাজ করে গেল। অল্প হলেও উনি কিছু একটা আমাকে শিখিয়েছেন। তিনি ছিলেন সুরের আলি অর্থাৎ সুরের প্রেমিক এবং লয়ের আকবর অর্থাৎ লয়ের অধিশ্বর।

উনার লয়ের একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি January1987 রবীন্দ্র সদনে নিখিল ব্যানার্জীর স্মৃতিতে খাঁ সাহেবের সঙ্গে বাজাবেন স্বপন চৌধুরী। খাঁ সাহেব গৎ ধরলেন, স্বপনদা ছোট্ট একটা উঠান বাজিয়ে সমে ফিরতেই একটু তাকিয়ে মাথাটা সরোদের দিকে ঝুঁকিয়ে বিস্তার আরম্ভ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেলেন। কোন গভীর লয়ে বিচরণ করতে লাগলেন যেন মাত্রাগুলিকে ভেঙ্গে চুরে তছনছ করে দিচ্ছিলেন, অবস্থাটা আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছিল যখন পৃথিবী বিখ্যাত তবলা বাদক স্বপন চৌধুরী ত্রিতালের প্রতিটি মাত্রা রাখতে গিয়ে হাঁটু ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি তুলে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন। আবার যখন গৎ-এর মুখড়ায় ফিরে এলেন, আবার একবার স্বপনদার দিকে তাকালেন আর স্বপনদার মুখের হাসি দেখে বুঝা গেল একটা অসহনীয় দুরূহ ঘটনা যেন পার হয়ে এলেন। ছোটবেলার একটা কথা মনে পড়ছে। আমি দেখতে মোটেই সুন্দর নই। আমি যখন তবলা শিখছি তখন আমার একটা ধারণা হয়েছিল আমি কোন দিন শিল্পী হতে পারব না। কারণ যাদেরকে দেখেছি সত্যিই তাঁরা সুন্দর। কিন্তু যেদিন আমি উস্তাদ আলি আকবর খাঁকে দেখেছি উনার বাজনা শুনে তন্ময় হয়ে গেছি, জেনেছি শিল্পী হতে সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, আমার সংশয় সেদিন থেকে কেটে গেলে। এই হেন কিংবদন্তী লয়ের সম্রাট প্রকৃতির লয়ে, বিশ্বব্রহ্মান্ডের লয়ে নিজেকে বিলীন করে দিলেন। তাঁর স্মৃতি ভীষণভাবে মনকে ভারাক্রান্ত করে।

ডঃ ভুপেন্দ্র নাথ শীল মহাশয়ের সরোদের সাথে বাজানোর জন্য বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর উৎসবে যাই। সেখানে একটি হোটেলে আমাদের থাকতে দেওয়া হোল। বেশ আরামে কিন্তু আরামটা বেশিক্ষণ স্থির হল না। বিকাল বেলায় আমাদের পাশের কামরায় এসে উঠেছেন পন্ডিত মণিলাল নাগ সঙ্গে তবলার পন্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। মনটা অস্থির হয়ে গেল। ইনি স্টেজে বাজাবেন। আস্তে আস্তে ভয় মনের কোণে জমতে লাগল। ঢুকলাম উনার রুমে। প্রণাম করলাম। কেন এসেছি জিজ্ঞাসা করেছেন। বললাম, বাজাতে এসেছি কিন্তু বাজনা মনে হয় হাতে নামবে না।

আপনারা এসেছেন দেখে এখনই বুক ধড়ফর করছে। অনিন্দ্যদা বললেন, শোন-বাজানোর সময় ভাববে আমরা কিছুই জানিনা, শ্রোতা হিসাবে বসে আছি। আর তোমার যা সম্পদ আছে তাই তুমি বাজাবে, নতুন করেতো কিছু করতে পারবে না। সুতরাং মাভৈঃ। আমরা প্রথম বাজিয়েছি। সত্যি গুরুজীর আশির্বাদে বাজনা ভাল হয়ে গেল। নেমে এসে মণিদা ও অনিন্দ্যদাকে প্রণাম করলাম। ওঁরা আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, কিরে এত গুছিয়ে তুই বাজিয়েছিস বেশ ভাল লেগেছে। আমরা বলছিলাম যে ওর বাজনা শুনে বোঝা যাচ্ছে ওর ভয় কেটে গেছে।

এধরণের অনেক ঘটনা যা আশীর্বাদ স্বরূপ আমার জীবনে ঘটেছে তা পরে যদি সুযোগ হয় তবে লিখব। অনেক সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব আছেন যাদের সাথে সঙ্গত করতে গিয়ে তাঁদের আশীর্বাদ পেয়েছি প্রশংসা পেয়েছি। অনেকেই বাজনা শুনে বলতেন 'তোমার বাজনার কথা বিমল কে বলব।' শ্রী বিমল রায় আমার পরবর্তী শিক্ষাগুরু ইনি অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতার টপ গ্রেডশিল্পী আমার শিল্পী জীবনের বিরাট ভূমিকা আমার গুরুজীর। আমি উনার কাছে শিষ্য হিসাবে কথা বলা থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমার প্রথম দিকের গুরু শ্রী সচ্চিদানন্দ হালদার যিনি মানিক হালদার নামে পরিচিত। অন্যজন হলেন শ্রী গৌরাঙ্গ শীল। উনাদের কাছে যদি সুশৃংখল শিক্ষা আরম্ভ না করতাম তা হলে যেখানে আছি সেটা হয়ত হত না। আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার গুরুদেবকে। এছাড়া যাদের কাছে বিন্দুমাত্র শিখতে পেরেছি তাদেরকেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

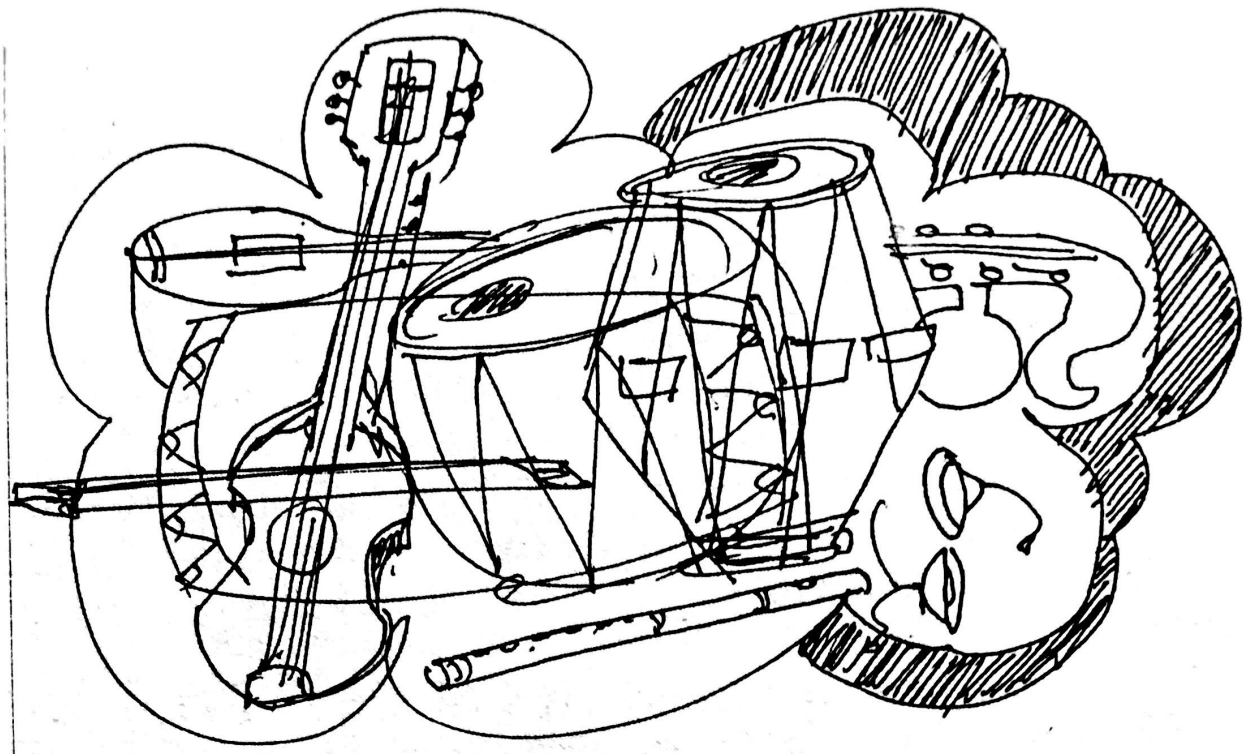

History of Musical Instruments

Sarita Banik (Visiting Lecturer)

Music occupies a special position in all human societies of the world. The emergence of music has given development of various types of musical instruments. Though the language and vocal music might have come later but the construction of musical instruments evidently dates with the earliest inventions which suggested themselves to human ingenuity wood, metal and the hide of animals are the important substances used in the construction of musical instruments. But it is important to be noted that musical instruments are not unfrequently formed in the shape of certain animals. In tropical countries, bamboo or some similar kind of cane and gourds are especially made use of for this purpose. The ingenuity of man has contrived to employ in producing music, horn, bone, glass pottery, slabs of sonorous stone - infact, almost all vibrating matter.

Several musical instruments are remarkable on account of their elegant shape and tasteful ornamentation. The mode in which individual countries or tribes are in the habit of embellishing their musical instruments is smetimes as characteristic as it is singular. An arrangement of the various kinds of musical instruments in a regular order, beginning with that kind which is the most universally known and progressing gradually to the least usual gives the following resu lts. Instruments of percussion of indefinite sonorousness or, in other

words, pulsatile instruments which have not a sound of a fixed pitch, as the drum, rattle, castanets etc. are most universal. Wind instruments of the flute kind, – including pipes, whistles, flutes, Pandean pipes etc. are also to be found almsot everywhere.

An investigation of the musical instruments of various nations may derive valuable hints for the improvement of the present; or even for the invention of new. Various museums have collected musical instruments for display and research. The collection at south Kensington, in U.K. Contains several foreign instruments which cannot fail to prove interesting to the musician. Recent investigations have more and more elicited the fact that the music of every nation exhibits some distinctive characteristics which may afford valuable hints to a composer or performer.

A collection of musical instruments deserves the attention of the ethnologist as much as of the musician. A complete account of the musical instruments from the earliest time known to us would require much more space. The musical instruments of Ancient Assyrians and Hebrews, Greeks and Romans, China, Persia and Arabia, Mediaeval Europe reveal the development of music of all the nations of the world.

As far as our contry India is concerned, Indian Musical instruments have a long history and there are wide variety of musical instruments. In India, Music was not only among the amusements. It was part of religious ceremonies and rituals. Samveda is one of the four vedas and in Samveda we find the detailed deseription of music and skill of music making. There were professional musicians in India for last 6000 years, and a great variety of musical instruments invented and developed in Indian. The great God that is Brahma - the creator, Vishnu - the protector and Mahesh the destroyer, keep one or the another musical instrument in their hands. Vishnu keeps conch, carliest natural wind instrument and Mahesh-Shiva keeps Damroo - a small drum in his hand. Narad the saint of all saints always keeps a veena in his hand and always on move from place to palce conveying religious message.

It is believed that Narada was the inventor of Veena. Veena was the principal musical instrument of India. Goddess Saraswati, the Goddess of knowledge and fine arts carrys the veena in her hand. Veena is undoubtedly the most important musical instrument. It is one of the oldest classical musical instrument. It has variety of forms. Ravanstra was one of the earliest stringed instruments. Sitar is another musical instrument. It is believed that sitar was invented by Amir Khusru. It is

the most important instrument of Northern India and is used for playing musical compositions. Veena is used for playing Raga Alapana and it is considerately easier to master sitar than the veena. Sarangi, Kinnari, Flute etc. are the musical instruments which occupy the important positions in India.

In Manuscripts, as well as in sculptures and paintings, we find several representations of Musical instruments of the middle ages. There are some early monuments of chirstian art dating from the fourth century in which the lyre is represented. In one of the them Christ is depicted as Apollo touching the lyre. Cithara was a name applied to several stringed instruments greating varying in form, power of sound, and compass. Rotta was one of the most interesting stringed instruments of the middle ages. It was sounded by twanging the strings, and also by the application of the bow.

In every nation of the world, we find different kinds of Musical Instruments and every musical instruments of a particular nation conveys the particular feature of a particular nation. In case of the Musical Instruments of Greeks and Romans, it is believed that the Greeks derived their musical system from the Egyptians. Lyre was one of the most important Musical Instruments of the Ancient Greaks. The Musical Instruments of the Romans are derived from the Etrucans. The Romans adopted many new Musical Instruments from Greece, Egypt and even from Western Asia and they did it during the time of the republic and especially sub-sequently under the reign of the emperors. But it is important to be noted that the only natioins which introduced eastern instruments into Europe. In case of the Musical Instruments of china, we find that the chinese consider the you especially valuable for musical purpose, because it always remains exactly the same pitch. The ancient chinese had several kinds of bells, frequently arranged in sets so as to constitute a musical scale. Respecting the orchestras or musical bands, represented on monuments of the middle ages, there can hardly be a doubt that the artists who sculptured them were not unfrequently led by their imagination rather than by an adherence to actual fact. Thus, we find that Music plays an important role in the development of human society and civilization. But without Musical Instruments, we cannot attain much entertainment from Music. It may be in the most primitive stage of development or in an ultra-modern stage, the Music has its own esential functions in all societies and it is important to be noted that musical Instrument plays the most essential role in forming various kinds of Music.

বর্তমান ভারতে রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধন উৎসবের তাৎপর্য

ছন্দা নন্দী

"সবারে করি আহ্বান,
এসো উৎসুকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ।"

আজকের ভারতবর্ষের বিভীষিকাময় অবস্থা উপশম করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংহতি বা ঐক্যের প্রতিষ্ঠা। এই সংহতি লাভের জন্য একটা বড় কিছু পাথেয় দরকার। এই নিশ্চিত পাথেয় হতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রাখীবন্ধন"।

'রাখীবন্ধন" উৎসবের তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় "রাখীবন্ধন" উৎসবটা কী? শ্রাবণী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত উত্তর ভারতের জনপ্রিয় উৎসব। এই উপলক্ষে হাতে রক্ষা বা রাখী (রঙিন সূতা) বেঁধে দেওয়া হয়। বাঁধার মন্ত্রে বলা হয়ঃ "যাহার দ্বারা মহাবলশালী দানবরাজ বলিকে বন্ধন করা হইয়াছিল আমি তাহার দ্বারা তোমাকে বন্ধন করিতেছি"। হিন্দু সমাজ ও জৈনদের মধ্যেও ইহা প্রচলিত। বাংলাদেশে এই উৎসবের তেমন প্রচলন ছিল না। তবে আধুনিক যুগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের স্মৃতিতে ৩০ আশ্বিন এবং বীরাষ্টমী ব্রত উপলক্ষে আশ্বিনের শুক্লা অষ্টমীতে নূতন ভাবে এই উৎসবের প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই উৎসবটি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে পালিত বাঙালীর জাতীয় ঐক্য অনুষ্ঠান। সেদিন ছিল বিজয়ার কাছাকাছি। ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি পূণ্যাহ। যেদিন ইংরাজ প্রশাসন বঙ্গভঙ্গের সরকারি নির্দেশ জারি করেছিলেন (বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রীঃ ১৯ শে জুলাই) তার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়ঃ-

"আগামী ৩০ শে আশ্বিন (১৩১২) বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে, কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই, তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালীর রাখীবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখীবন্ধনের মন্ত্রটি এই "ভাই ভাই এক ঠাঁই"।

বাঙালীর তনুমনধনকে একসূতোয় গেঁথে রবিঠাকুর গেয়েছিলেন -

"একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন"।
"বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পূন্য হউক, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান"।

নজরুল তখনই গেয়েছিলেন - "মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম
হিন্দু-মুসলমান
মুসলিম তাঁর নয়নমণি
হিন্দু তাঁহার প্রাণ"।

এই ঘোষণামত রাস্তায় শোভাযাত্রার পুরোভাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে রাস্তার জাতি, ধর্ম, বর্ণ-মুক্ত সকলের হাতে পরিয়ে দিলেন মিলনের প্রতীক রাখী। দ্বিজাতির ভেদচিহ্ন ছিন্ন করে যে গ্রন্থিতে বাঙালি একত্রিত হল সেটিই রবিঠাকুরের "রাখীবন্ধন" উৎসব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "রাখীবন্ধন" উৎসবের প্রেরণার ফলে সংহত বাঙালী সমাজ ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুর্বার শক্তি সহযোগে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে নামতে পেরেছিল। ফলে ইংরেজ শাসকের আদেশ নষ্ট হয়ে যায়। এরপর ভারতবর্ষ পেল তাঁর শত সহস্র শহীদের রক্তে ঝড়া স্বাধীনতা। তারপর ভারতের সংবিধান গৃহীত হল - "সমগ্র দেশের স্বাধীনতা, মৈত্রী, শান্তি ও ঐক্যের প্রতীকরূপে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল।"

এরপরের ইতিহাস পার হয়ে আমরা বর্তমান ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছি, একবিংশ শতকের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা কী দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি? শুধু পাঞ্জাব, আসাম, কাশ্মীর নয় - দেশের সর্বত্র নানা বিভেদমূলক শক্তি সম্প্রদায়ের নামে, ধর্মের নামে, ভাষার নামে, জাতপাতের নামে, ভারতীয় সমাজে এক নিদারুণ বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি করে দেশকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভাগ করে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। চারিদিকে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ রূপ জ্বালাময়ী নাগিনীরা বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলে চলেছে। কিন্তু আমরা কি সত্যিকারের স্বাধীনতা পেয়েছি? আজ একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমদের নিজেদের স্বাধীন বলতে লজ্জা করে।

রবীন্দ্রনাথ একদা মায়ের পাগল করা দামাল ছেলেদের আহ্বান করেছিলেন -

"মার অভিষেক এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

আজ ভারতমাতার স্বাধীনতার ৬১ বছর পরেও আমরা ভারতলক্ষ্মীর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারিনি বা মঙ্গলঘট ভরতে পারিনি।

নাগাল্যান্ডের নেতা ফিজো স্বাধীন নাগাভূমির দাবিতে, দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুতে ডি. এম. কে. দলের নেতা আন্নাদুরাই ভাষার জন্য, পূর্ব ভারতের মিজোরামের নেতা লালডেঙ্গা

স্বাধীন মিজোরাম দাবিতে, অসমের অহমিয়ারা 'বিদেশী প্রশ্নে' গোঁ ধরে আছে এবং মণিপুরের পথে পথেও সামরিক বাহিনী। এমনকি ত্রিপুরায় উপজাতি বাঙালী দাঙ্গা হয়ে গেছে। ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাবীদের 'খালিস্তান' দাবি, কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে তাদের নগ্নরূপ ফুটিয়ে তুলেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায় বহু দল মতের-প্রাধান্যতার ফলে বিচ্ছিন্নতার রন্ধ্রপথে প্রবেশ করেছে অমানুষিকতা, ভ্রাতৃবিরোধ বা সাম্প্রদায়িকতা। মন্ডল কমিশন, বাবরি মস্‌জিদে ও রামলীলা ভারতের মত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের গায়ে কালিমা লেপন করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সাবধান করে বলেছিলেন - "এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায়, বর্বরতায় আমাদের নতুন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।" কিন্তু ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের এখন যা অবস্থা "শতাব্দীর সূর্য আজ রক্তমের মাঝে অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী। আজকের ভারতে ধর্ম নিয়ে যে বাড়াবাড়ি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধেই বলে গেছেন - "ধর্ম কখনো আমাদের মেলাতে পারে না, বরঞ্চ হাজারখানা বেড়া গড়ে তুলে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবকে সৃষ্টি করে।" তিনি আরও বলেছেন -

" যে দেশে প্রধানতঃ ধর্মই মানুষকে মেলায়, অন্য কোন বাঁধন তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য"। "গোঁড়ামির মোহ" সম্বন্ধে "কর্মযোগ" নামক গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ বার বার আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। বিভেদকামী এই শক্তির মোকাবিলা আমরা এখনো করতে পারি সংবিধানের পাশে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থের মহামানবের সাগরতীরে দাঁড়িয়ে আজ থেকে ১০২ বছর আগেকার সেই ১৬ই অক্টোবরের রাখীবন্ধনের দিনটি স্মরণ করে সেদিন যা ছিল বাঙালীর ঘরের সংকল্পমাত্র আজ তা ভারতের সকলের সংকল্প হতে বাধা নেই।

শত শত শহীদ প্রাণ দেয়, ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে ঐক্যের দিকে আমাদের আহ্বান করেছেন। সেই রাখী বন্ধন আমাদের জাতীয় জীবনে ফিরিয়ে আনুক সেই মন্ত্র। "ভাই ভাই এক ঠাঁই"।

তাই আমরা এই রাখী বন্ধন উৎসবে যেন এই অঙ্গীকার গ্রহণ করতে পারি

"নিখিলবন্দীর আত্মার মুক্তি হোক আমাদের জয়যাত্রার পাথেয়।"

তাহলেই রবীন্দ্রনাথের "রাখী বন্ধন" উৎসবের হবে সার্থকতা। রাখী বন্ধনকে অনুসরণ করে আমরা একে অপরের সাথে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারলেই এই ভারতকে ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব। হাতে রাখী বাঁধলেই হবে না। মনের দিক থেকেও সমস্ত বিভেদ দূর করে দেশের কথা, দশের কথা চিন্তা করতে হবে। "রাখীবন্ধন" উৎসবকে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুরে সুর মিলিয়ে বর্তমান ভারতের জনগণ যেন বলতে পারে -

"তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো
আমার দখিন হাতে।
সূর্য যেমন ধরার করে
আলোক রাখী জড়ায় প্রাতে।"

কুচিপুড়ি নৃত্য সম্পর্কে কিছু কথা

ববি চক্রবর্তী

ভারতীয় সংস্কৃতিকে সুপ্রসিদ্ধ স্তরে নিয়ে আসতে কুচিপুড়ি নৃত্যশৈলীর (অন্ধ্রপ্রদেশ) এক বিশেষ অবদান লক্ষ্য করা যায়। কুচিপুড়ি যদিও অনেক পুরনো নৃত্যশৈলী তথাপি এর প্রসার ঘটেছে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে।

অন্ধ্র প্রদেশের বিজয়ওয়াড়া থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে কুচিপুড়ি গ্রামটি অবস্থিত (কৃষ্ণ জেলার দিভি সীমাঞ্চলে)। এই গ্রামের 'ভাগবতুলু' ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় 'মেলাম' বা 'গোষ্ঠী নৃত্যের ভান্ডার' হিসাবে পরিচিত।

কুচিপুড়ি নামের উৎপত্তি ইতিহাসে নানা ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলি হচ্ছে —

(১) 'কুচি' মানে মহিলা নৃত্যশিল্পী আর পুরুষ নৃত্যশিল্পীদের বলা হতো কুচ্চেনা। সম্ভবত: পরবর্তী সময়ে লিঙ্গ বিচার উঠে গিয়ে সকল নৃত্যশিল্পীকে 'কুচি' বলা শুরু হয়। পরে ব্রাহ্মণ নৃত্যশিল্পীদেরই মুলত: কুচি বলা হত।

'পুড়ি' মামে নদীর তীরে পলিমাটির উপরে গড়ে ওঠা একটি গ্রাম।

(২) গ্রামটি কুচেলা পুরি নামেতে পরিচিত। একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ভগবান কৃষ্ণের বন্ধু কুচেলা এই গ্রামে বাস করতেন এবং রামলিঙ্গেশ্বর মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। কুচিপুড়ি নৃত্যের জনক সিদ্ধেন্দ্রযোগী স্থানীয় ব্রাহ্মন শিল্পীদের 'ভামকলাপম' শিক্ষা দিয়ে কুচেলাপুড়ির নাম কুচিপুড়িতে পরিবর্তন করেন। আবার এই গ্রামটি 'কুশীলব' নামেও পরিচিত। কারণ সংস্কৃত ভাষায় কুশীলবকে অভিনেতা বলা হয়।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের পর অচ্যুত্যপ্পানায়ক ৫০০ ব্রাহ্মণ পরিবারকে বাড়ি, কুয়ো ও চাষযোগ্য জমি দান করেন। সেই থেকে এই গ্রামের নাম হয় 'অচ্যুতপুরুম', এখন এটাকে বলা হয় মেলাতুর যা তাঞ্জোর থেকে ১০ মাইল দূরে। কুচিপুড়ি ব্রাহ্মণদের চাষের সঙ্গে কঠোর নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে নৃত্যচর্চা করতে হতো। সেই সময় কুচিপুড়ি গ্রামে বেশ কিছু অসাধারণ নৃত্যশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে। যেমন - ক্ষেত্রঘ্ন, তীর্থনারায়ণ যাতি, সিদ্ধেন্দ্রযোগী। এরমধ্যে ক্ষেত্রঘ্ন-এর সৃষ্টি 'মুভ্যগোপাল পদম্', তীর্থ-নারায়ণ যাতির 'কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিনী' এবং সিদ্ধেন্দ্রযোগীর পারিজাতহবণম হল অনবদ্য নৃত্যনাট্য সৃষ্টি - যা কুচিপুড়ি নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা পরিবেশন করানো হত। এটি সর্বোৎকৃষ্ট নৃত্যশৈলীর সৃষ্টি বলে স্বীকৃত।

কুচিপুড়ি নৃত্যশিল্পীরা নিজে গান গেয়ে নৃত্য পরিবেশন করতেন যা বাচিক অভিনয় এবং এরা যজ্ঞগণ নামে পরিচিত। আমাদের বাংলা ভাষায় যাকে বলা হয় যাত্রা।

আগেকার দিনে যেহেতু মহিলাদের নৃত্যকলা পরিবেশন করার বাধা ছিলো সেহেতু পুরুষ শিল্পীরাই মেয়ে সেজে নৃত্য পরিবেশন করতেন। গুরু বেদান্ত সত্যনারায়ণ শর্মা এখনো শুধু নারী চরিত্র (সত্যভামা) অভিনয় করেন। এই নৃত্যের ইতিহাসে কোথাও অভিনয় দেবদাসীদের উল্লেখও

পাওয়া যায়। এই নৃত্যশৈলীতে নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরন করা হয়। নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য এই শৈলীতে পরিলক্ষিত হয়। কুচিপুড়ি নৃত্যের সঙ্গীত মূলত: সংস্কৃত ও তেলুগু ভাষায় পরিবেশিত হয়।

কুচিপুড়ি নৃত্যে চিন্নাভেঙ্কটরামাইয়া ভেম্পতি ভেঙ্কটনারায়ণ ও বেদান্ত লক্ষ্মীনারায়ণ শাস্ত্রীকে ত্রিমূর্তি বলা হয়। এই নৃত্যের যজ্ঞগণের রূপ ভেঙ্কটরামাইয়ার সৃষ্টি। এরপর থেকে যা কুচিপুড়ি ধ্রুপদী নৃত্যে নতুন মাত্রা যোগ হয়।

পুরানো ট্র্যাডিশান অনুসারে দুইজন পর্দা দিয়ে আড়াল করে নৃত্যশিল্পীকে মঞ্চে নিয়ে আসেন। তারপর পর্দা সরে গেলে শিল্পী পূর্বরঙের পুর্নবচন করে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করেন যাতে অপদেবতার অশুভ দৃষ্টি না পড়েএরপর শিল্পী ক্রমান্বয়ে তার নৃত্য পরিবেশন করেন।

পরবর্তী সময়ে ভেম্পতি চিন্নাসত্যম্ এই নৃত্যে অস্ত্রের পরিবর্তে মুদ্রার মাধ্যমে নৃত্যের (নাট্যধর্মী) উপস্থাপনা করেন। বর্তমানে গুরুভেম্পতি চিন্নাসত্যম্, স্বপ্নাসুন্দরী, শোভানাইডু, রাজা রেড্ডি, উমারামারাও ইত্যাদি প্রখ্যাত গুরুদের দ্বারা বিভিন্ন প্রান্তে এই নৃত্যে শিক্ষার প্রসারে কৃত্তিত্ব রাখেন এবং এর ফলস্বরূপ এই নৃত্যকলা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীর অর্ন্তভুক্ত হয়। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের রাজ্যে এই নৃত্যকলার প্রসার ঘটবে এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

কলাতীর্থ

কল্পনা দে

এখানে আকাশ নীল, বাধাহীন, উন্মুক্ত, উদার —
দূরে সারি দিয়ে আছে ঘন সবুজ পাহাড়।
ভেসে চলে সুর, অবাধে - আকাশে, পাহাড়ে,
দিক-দিগন্ত, নিকট-সুদূর ভরে যায় সুরে।

এখানে কৃষ্ণচূড়া আকাশে আগুন ছড়ায় বসন্তে,
যেন অস্তরবির লাল আঁচল ঐ দিগন্তে।
গানের সাথে রঙের খেলা কত অনুরাগে,
ইমন, কেদার, কাফি, বসন্ত, বাহার-বেহাগে।

এখানে রিমঝিম বর্ষা আসে মল্লার রাগে,
ভীম বর্ষার তবলা-তরঙ্গ ঘুঙুরের বোলে জাগে।
কবির গানের সুরের মায়ায় গাছের তলে
নেশায় ঘুমায় শ্রান্ত শ্রমিক কাজ ফেলে।

এখানে গর্বে দাঁড়িয়ে আছে দুটি শীস্‌মহল
যাদের ভেতরে স্বপ্ন -জোনাকি, সদা, জ্বলজ্বল।
সবাই মও সৃষ্টি সুখে, শিল্প গড়ার সাধনায়,
কেউ ডুবে রং- তুলিতে, কেউ বা সুরের উপাসনায়।

এখানে সেতার -সরোদের ঝালা-ঝঙ্কার, তানালাপ বোলবানী,
ছবি আঁকা আর মূর্তিগড়ার সঙ্গে করে কানাকানি।
লিচুবাগান না নন্দনকানন ! সংশয় জাগে তাই,
নাকি কলাতীর্থ — যার তীর্থপথিক আমরা সবাই।

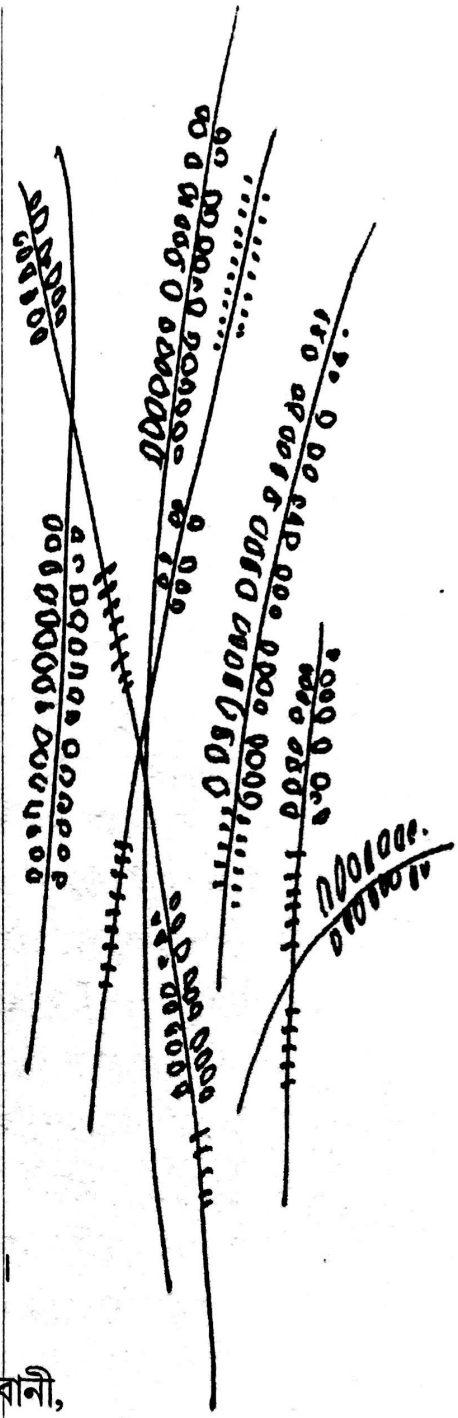

কীর্তিমান পুলিন ঠাকুর

মনিকা দাস

বাক্‌দেবীর বর পুত্র
কণ্ঠে সুরের খেলা,
সর্বজন বন্দিত তিনি
গলায় বরণমালা।
জন্ম তাহার
আগরতলার কৃষ্ণনগরে,
প্রতিভাধর শিল্পী ছিলেন
সকলে গর্ব করে।
মার্চের দশ তারিখে
উনিশশো চৌদ্দ সালে,
জন্ম নিয়ে এলেন তিনি
হীরালাল ও শান্তিপ্রভার কোলে।
কণ্ঠভরা সুর নিয়ে
মেতে থাকতেন তিনি।
স্কুল পালিয়ে মাঠে ঘাটে
গেয়ে বেড়াতেন তিনি।
এসব খবর ধীরে ধীরে
রাজা শুনতে পান,
রাজার আমন্ত্রণে তিনি
রাজসভায় করেন গান।
গান শুনে মুগ্ধ রাজা
দিলেন সম্মান।
পঁচিশ টাকা বৃত্তি নিয়ে
তালিম নিতে যান।
ভর্তি হলেন লক্ষ্ণৌর সেই
মরিস কলেজে,
বিখ্যাত সব গুণী শিল্পী
যেথায় বিরাজে।
রতন ঝংকার গুরু ছিলেন
ছিলেন আগা খাঁ,
পরবর্তী গুরু হলেন
ওস্তাদ বরকত আলি খাঁ।
রপ্ত করেন গায়ন শৈলী
রঙ্গিলা ঘরানার
সিদ্ধিলাভ করেন তিনি
কঠোর সাধনায়।
এরপর ঘরের টানে
এলেন আগরতলায়
সবার জন্যে স্থাপন করলেন
বীরবিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়
সেটিই তবে ক্রমে ক্রমে
তাঁর চালনায়,
নব কলেবরে হল
সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়।
জ্ঞানী, গুণী শিল্পীদের
এটি তীর্থস্থান,
স্থানান্তরিত হয়ে এটি
এল লিচুবাগান।
সরকারী সহায়ায় হল
নতুন ম্যানশন,
যার প্রতিষ্ঠাতা এই
পুলিন দেববর্মন।
ত্রিপুরার গর্ব তিনি
ছিলেন কীর্তিমান,
তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল
এই প্রতিষ্ঠান।

সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ

পুলিন চন্দ্র দেববর্মা (কণ্ঠসঙ্গীত)
অশ্বিনী বিশ্বাস (তবলা)
ঝর্ণা দেববর্মা (কণ্ঠসঙ্গীত)
গৌরী চক্রবর্তী (কণ্ঠসঙ্গীত)
শুভ্রা দাশ (কণ্ঠসঙ্গীত)
অনন্ত বিজয় দেববমা (নৃত্য)
ব্রজগোপাল সিন্‌হা (রবীন্দ্র সঙ্গীত)
উৎপলকৃষ্ণ দেববর্মা (সেতার)
অনাথবন্ধু দেববর্মা (সরোদ)
অঙ্গনতম্বি সিংহ (মণিপুরী নৃত্য)
সুবর্ণ চৌধুরী (তবলা)
সাধন ভট্টাচার্য্য (কণ্ঠসঙ্গীত)
কণিকা চক্রবর্তী (দেববর্মা) (কণ্ঠসঙ্গীত)
নৃপেন্দ্র নাথ দে (এসরাজ)
পিনাকপানি গুপ্ত (তবলা)
রতন কুমার সেনগুপ্ত (কণ্ঠসঙ্গীত)
তাপসী দত্ত (কণ্ঠসঙ্গীত)
গোপাল বিশ্বাস (তবলা)
লহরী দেববর্মা (সরোদ)
ধীরেন দেববর্মা (কণ্ঠসঙ্গীত)
বিহার রঞ্জন সিংহ (কথকনৃত্য)
রমেন্দ্রনাথ দে (কণ্ঠসঙ্গীত)
লক্ষ্মীকান্ত সরকার (তবলা)
অনিল কুমার ঘটক (তবলা)
প্রিয়ব্রত চক্রবর্তী (তবলা)
নারায়ণ দেববর্মা (কণ্ঠসঙ্গীত)
গণেশ দেববর্মা (কণ্ঠসঙ্গীত)
মণীন্দ্র চৌধুরী (তবলা)
প্রিয়নাথ মজুমদার (তবলা)
প্রদ্যুত কুমার ভট্টাচার্য্য (তবলা)
ফুলকুমারী জমাতিয়া (কণ্ঠসঙ্গীত)
চিত্তরঞ্জন আঢ্য (বেহালা)
ব্রজহরি দেবনাথ (তবলা)
রবীন্দ্র চন্দ্র দাস (বাঁশী)
কিশোর রঞ্জন সিংহ (সেতার)
মঙ্গল ঋষিদাস (তবলা)
শ্যামলী দেববর্মা (কণ্ঠসঙ্গীত)
পথিকা দেববর্মা (কণ্ঠসঙ্গীত)
মণিমঞ্জরী চক্রবর্তী (এস্‌রাজ)
সতীন্দ্র দাস (কণ্ঠসঙ্গীত)
আরতি কর (কণ্ঠসঙ্গীত)
শিবেন্দ্র চক্রবর্তী (কণ্ঠসঙ্গীত)

ডেপুটেশনে যাঁরা এসেছিলেন

অসীমা ভট্টাচার্য্য (কণ্ঠসঙ্গীত)
নবনীতা দেব চৌধুরী (বাংলা)
শীলা সিন্‌হা (কথক)
হারাধন ঋষিদাস (তবলা)
কাবেরী গুপ্ত (কণ্ঠসঙ্গীত)
ডঃ উমাশঙ্কর চক্রবর্তী (কথক)
রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিংহ (নৃত্য)
বিশ্বদেব ভট্টাচার্য্য (তবলা)

প্রাক্তন অধ্যক্ষ

কুমুদ রঞ্জন ব্যানার্জী
কে. পি. দত্ত
পি. এন. ভার্বে
ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক
ডঃ পদ্মিনী চক্রবর্তী
ধীরেন্দ্র দেববর্মা (ভারপ্রাপ্ত)

শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়

অধ্যক্ষ ঃ শ্রী রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য (ভারপ্রাপ্ত)

বর্তমান অধ্যাপক/অধ্যাপিকাগণ

প্রদীপ ভট্টাচার্য্য (তবলা)
মণিকা দাস (বাংলা)
ডঃ মৃণাল চক্রবর্তী (কণ্ঠ-ডেপুটেড)
অলকেন্দ্র দেববর্মা (সরোদ)
মুক্তা চক্রবর্তী (কণ্ঠসঙ্গীত)
শান্তিভূষণ দেব (সেতার)
রণজয় দেব চৌধুরী (তবলা)
প্রশান্ত দেববর্মা (তবলা)
মৃণাল রায় (তবলা)
বঙ্কিম সিন্‌হা (মণিপুরী নৃত্য)
নারায়ণ মজুমদার (তবলা)
সুনেত্রা রায় (কণ্ঠসংগীত)
প্রদীপ সরকার (তবলা)
দেবাশিস দেবনাথ (তবলা)
জয়ন্ত রঞ্জন ধর (তবলা)
মৃণাল কান্তি দাস
সুতপা চৌধুরী
প্রীতম দেববর্মা
যোশী দেববর্মা

অফিস কর্মী

সন্ধ্যা বণিক (হেড ক্লার্ক)
কৃষ্ণা চৌধুরী (ইউ. ডি. সি.)
মায়া রায় (ইউ. ডি. সি.)
কল্পনা চক্রবর্তী (এল. ডি. সি.)
রথীন আচার্য্য (এল. ডি. সি.)
অঞ্জনা চক্রবর্তী (গ্রন্থাগারিক)
কল্পনা সাহা (সহঃ গ্রন্থাগারিক)

পার্ট টাইম অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা

শুক্লা ভট্টাচার্য্য (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
সীমা ঘোষ (রীবন্দ্র সঙ্গীত)
কল্পনা দে (বাংলা)
কাকলি দাস (শাস্ত্রীয় সঙ্গীত)
সংহিতা ঘোষ (ভরতনাট্যম)
ছন্দা নন্দী (রবীন্দ সঙ্গীত)
মানসী ঘোষ (কথক)
শ্যামল দেব (তবলা)
সুব্রত তালুকদার (তবলা)
সুশান্ত লোধ (কণ্ঠসঙ্গীত)
চিন্ময় দাস (কথক)
সবিতা বণিক (ইংরেজী)
মিলি সাহা (রবীন্দ্র সঙ্গীত)
ববি চক্রবর্তী (কুচিপুড়ি)
সুনেত্রা রায় (কণ্ঠসঙ্গীত)

পদ্ম মোহন দেববর্মা (ডুপ্লিকেটিং)
থেটর রায় (গ্রুপ ডি)
নন্দ দুলাল দত্ত (গ্রুপ ডি)
রাজ রঞ্জন দেববর্মা (গ্রুপ ডি)
প্রণতি সরকার
আলিয়া বেগম (গ্রুপ ডি)
সমীর চন্দ্র দেব (গ্রুপ ডি)
পরমলাল হরিজন (ডি. আর. ডব্লিউ)
বিকাশ ভট্টাচার্য্য (গ্রুপ ডি)
অরুণ চক্রবর্তী (নাইট গার্ড)
শেফাল সাহা (গ্রুপ ডি)

মূর্ছনা

(সংগীত, শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা)

'মূর্ছনা' -সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের নব রূপায়নে,
নবযাত্রাপথের প্রথম পদচারণার ব্রাহ্ম মুহূর্তের স্মারক গ্রন্থ।
আমাদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে মহাবিদ্যালয়ের
বিশেষ উদ্যোগে এই প্রথমবার মূর্ছনা বিভিন্ন ধারার সৃষ্টিশীল সাহিত্য
সংগ্রহ নিয়ে পাঠকদের সামনে আত্মপ্রকাশ করছে। যে কোন শিল্পের মাধ্যমে
জীবনবোধকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্বকে অস্বীকার করা যায় না।
তাই সঙ্গীত শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, গায়ক বাদক, শিক্ষক, ছাত্র সকলকে সাহিত্য ও
নন্দনচর্চার দ্বারা চিন্তাশীল লেখক-লেখিকা তৈরি করা এবং জীবনবোধ ও মননের
ক্ষেত্রে সামগ্রিক সমৃদ্ধি ঘটানো 'মূর্ছনা'র উদ্দেশ্য।
সমাজকে উদার ও সুস্থ মানবিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে শুধু শিল্প-সংস্কৃতি নয়, সাহিত্যচর্চাও
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তেমনি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে 'মূর্ছনা' একটি ক্ষুদ্রতর প্রয়াস।
পরিশেষে 'মূর্ছনা'র সৃজনশীল নান্দনিক সাহিত্য আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য লেখক, লেখিকা, কবি, শিল্পী সকলের প্রতি
আবেদন থাকছে। আশা রাখছি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের স্মৃতিকে সাক্ষী করে সদ্যোজাত 'মূর্ছনা' প্রতি বছর পায়ে পায়ে এগিয়ে
যাবে এবং ধীরে ধীরে একদিন শিল্প-সাহিত্যের আঙ্গিনায় এর সাফল্যময় উত্তরণ ঘটবে।